মাসুদ রানা

আবার সোহানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনা

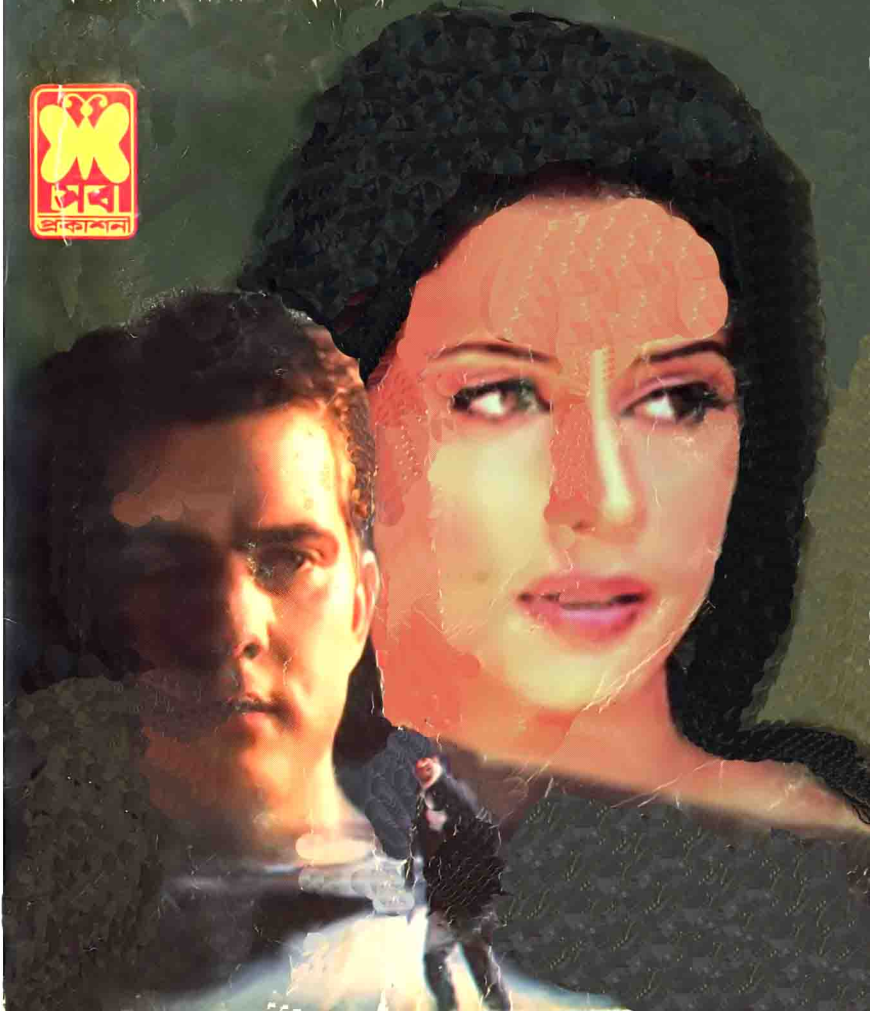

মাসুদ রানা

আবার সোহানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

ইজরায়েল ছোট্ট একটা দেশ, ঘিরে রেখেছে তাকে ছোট-বড় অনেকগুলো মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র। অথচ যুদ্ধ বাধলে মুসলমানরা হারে আর ইহুদিরা জেতে কেন?

সামি কাদরির চুরি করা একটা ফাইলে এই রহস্যময় প্রশ্নের চমকপ্রদ জবাব আছে। কিন্তু সেটা পেয়েও পেল না সোহানা। এরপর ব্যাপারটা বিরাট একটা ধাঁধা হয়ে উঠল। এক রহস্যময়ী তরুণীর পিঠে আঁকা উল্কিতে আছে সমস্ত ধাঁধার সমাধান।

রানাকে এখন খুবই দরকার।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা - ৩৪০

আবার সোহানা

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ শামীম ফয়সাল

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)

facebook.com/groups/Banglapdf.net

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books)

facebook.com/groups/we.are.bookworms

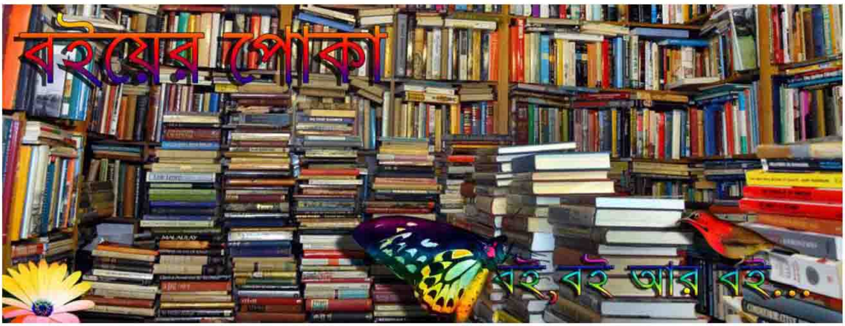

মাসুদ রানা ৩৪০

আবার সোহানা

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

সেবা
প্রকাশনী

চৌত্রিশ টাকা

ISBN 984-16-7340-1

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৪

প্রচ্ছদ: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৮০৭৪০৮ (M-M)
জি. পি. ও বক্স ৮৫০
E-mail: Sebaprok@citechco.net
Web Site: www.ancbooks.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-340
ABAR SOHANA
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা *তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত* সতর্ক শয়তান *নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি *জিপসী *আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর*শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ* শত্রু বিভীষণ *অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা*অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস *আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া *তুরুপের তাস *কালসাপ গুডবাই, রানা* সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা! *দেশপ্রেম *রক্তলালসা *বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট *ভাইরাস X-99 *মুক্তিপণ *চীনে সঙ্কট *গোপন শত্রু মোসাদ চক্রান্ত *চরসদ্বীপ *বিপদসীমা *মৃত্যুবীজ *জাতগোক্ষুর *আবার ষড়যন্ত্র অন্ধ আক্রোশ *অশুভ প্রহর *কনকতরী *স্বর্ণখনি *অপারেশন ইজরাইল শয়তানের উপাসক *হারানো মিগ *ব্লাইন্ড মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত *সবুজ সঙ্কেত *অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা *গহীন অরণ্য *প্রজেক্ট X-15 অন্ধকারের বন্ধু।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

গ্রিস। শহরটার নাম লিটোখোরন।

নির্মেঘ, নীল গম্বুজের ঠিক মাঝখানে উঠে এসেছে সূর্য, এই সময় ব্যস্ত অ্যাথেনা অ্যাভিনিউয়ে ঢুকল রেন্ট-আ-কার কোম্পানির ঝকঝকে একটা সাদা মার্সিডিজ। গাড়িটা চালাচ্ছে অপরূপ সুন্দরী এক মেয়ে। ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্ট সে, কর্মক্ষেত্র ইউরোপ আর মধ্যপ্রাচ্য, নাম সারাহ শাফুরা। এটা আসলে তার কাভার।

যদিও সপ্তাহের মাঝামাঝি সময় এখন, তারপরও শহরের চৌরাস্তায় মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে। দেশী লোকজন তো আছেই, বিদেশী ট্যুরিস্টরাই সংখ্যায় বেশি।

স্রোতের মত পর্যটক টেনে আনবার কারণটা দূরে, রাশি রাশি মেঘের ভিতর থেকে রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথাচাড়া দিয়ে আছে: ৯৫৭০ ফুট উঁচু মাউন্ট অলিম্পাস।

সাংবাদিক সারাহ শাফুরা চৌরাস্তার এক ধারের কফি শপের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাল একবার। গলা শুকিয়ে আছে, পা আর পিঠ ভয়ানক আড়ষ্ট। সেই অ্যাথেন্স থেকে রওনা হওয়ার পর টানা ছয় ঘণ্টা হলো গাড়ি চালাচ্ছে ও। চারদিকের ভারী ট্র্যাফিকের উপর সারাক্ষণ সতর্ক নজর রাখতে হওয়ায় আরও বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

তবে হাতঘড়ির উপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে যাত্রা বিরতির ইচ্ছেটা বাতিল করে দিল শাফুরা। হাতে সময় নেই। যে

ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে ও, সময় মত ওকে নির্দিষ্ট জায়গায় না পেলে তিনি অপেক্ষা করবেন না...বলা উচিত, অপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

সরু রাস্তাটা অনায়াসেই পেয়ে গেল শাফুরা, সন্ত্রস্ত সাপের মত মোচড় খেয়ে ৩,৬০০ ফুট লেভেলে উঠে গেছে। জায়গাটার নাম প্রিয়োনিয়া। এখানে, নিবিড় পাহাড়ি পাইন বীথির ভিতর, বড়সড় পার্কিং এরিয়া।

মার্সিডিজের জন্য ফাঁকা একটা জায়গা খুঁজে নিল শাফুরা। আশপাশের আর সবার মত গাড়ির ট্রাঙ্ক থেকে একটা ন্যাপস্যাক আর একজোড়া ভারি হাইকিং বুট বের করল। বুট জোড়া পরে ব্যাগটা কাঁধে ঝোলাল, তালা দিল গাড়িতে, তারপর ভাঁজ খুলে চোখ বুলাল একটা ম্যাপে।

প্রিয়োনিয়া থেকে তিনটে সরু আঁকাবাঁকা পথ পাহাড় পেঁচিয়ে উঠে গেছে। ওকে যেমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মাঝখানের পথটা ধরে উঠতে শুরু করল। পরনের জিনস আর কালো সোয়েটার, কাঁধ পর্যন্ত কাটা সোনালী চুল, চোখের সানগ্লাস ইত্যাদি আসলে ছদ্মবেশেরই অংশ, পরিবেশ আর ট্যুরিস্টদের সঙ্গে দারুণ মানিয়েও গেছে। এমন কী উপর আর নীচের পথে ওর মত নিঃসঙ্গ তরুণীও দু'চারজনকে দেখা যাচ্ছে। অনেকেই বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে উঠছে। চারদিকে খুব হইচই, প্রায় উৎসবমুখর একটা পরিবেশ।

এই ছদ্মবেশও সেই ভদ্রলোকের অনুরোধে নিতে হয়েছে। ভদ্রলোকের নাম সামি কাদরি। কায়রোর দৈনিক 'দ্য ডেইলি নাইল'-এর রিপোর্টার তিনি, প্রায় বিশ বছর হলো ফরেন সেকশনে আছেন। ওই একই পত্রিকায় শাফুরাও ফ্রিল্যান্সার হিসাবে লেখালেখি করে। খবর সংগ্রহের সূত্রে এখানে সেখানে প্রায়ই দেখা হয়, ফলে পরস্পরকে খুব ভালভাবে চেনে ওরা। বয়সে বেশ বড়, তার উপর গুণী সাংবাদিক, সামি কাদরিকে শ্রদ্ধা করে

শাফুরা; কাদরিও ওকে খুব স্নেহ করেন।

জন্মসূত্রে ভদ্রলোক একজন ফিলিস্তিনি। তেল আবিবে তাঁর পৈত্রিক বাড়ি আছে। বাড়িতে স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা ছাড়া আর কেউ থাকে না। ইজরায়েল সরকার ভিসা ইস্যু করতে অস্বীকার করায় স্ত্রী ও কন্যাকে কায়রোয় আনতে পারছেন না বলে দুঃখের তাঁর সীমা নেই।

সেই দুঃখ আরও অসহনীয় হয়ে উঠল স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদে। অকস্মাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন ভদ্রমহিলা, চিকিৎসার কোন সুযোগই দেননি ডাক্তারদের।

শাফুরা তখন কায়রোতেই। সামি কাদরির ফ্ল্যাটে সহানুভূতি জানাতে এসে তাঁর জিনিস-পত্র গোছগাছ করে দিল ও। সেদিনের ফ্লাইটেই তেল আবিবে ফিরে যাচ্ছেন তিনি। চাকরিটা ছেড়ে দিয়েই যেতে হচ্ছে, কারণ মেয়ে বড় হয়ে যাওয়ায় তাকে একা কোথাও রাখা সম্ভব নয়। আর কায়রোয় যে নিয়ে আসবেন সে উপায়ই তো নেই। ইজরায়েল সরকার আগেই জানিয়ে দিয়েছে, কোন মুসলিম পরিবারের সবাইকে ভিসা দিতে নীতিগতভাবে রাজি নয় তারা।

তারপর, একেবারে শেষ মুহূর্তে, এই শোক আর দুঃখের মধ্যেও একটা ভাল খবর পাওয়া গেল। 'দা ডেইলি নাইল' কর্তৃপক্ষ সামি কাদরিকে তেল আবিবে পত্রিকার স্থায়ী আবাসিক প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ দান করেছেন।

খবরটা শুনে কেমন যেন হকচকিয়ে গেলেন কাদরি, শাফুরার দৃষ্টিতেও তা ধরা পড়ল। ওর মনে পড়ল, গত কয়েক মাস ধরেই একটু বেশি সজাগ, নার্ভাস আর উত্তেজিত বলে মনে হয়েছে ভদ্রলোককে–যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা জানতে পেরেছেন, অথচ কাউকে কিছু বলতে পারছেন না।

যাই হোক, সামি কাদরি নিজের দেশ প্যালেস্টাইনে ফিরে গেলেন। শাফুরা ধরেই নিয়েছিল আর কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা

হবে না। পত্র বিনিময়ও সম্ভব নয়, কারণ প্যালেস্টাইন ইজরায়েলি পোস্টাপিসের কর্মচারীরা মুসলমানদের চিঠি-পত্র বিলি না করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়।

ছাব্বিশ মাস পর হঠাৎ শাফুরার লন্ডনের ঠিকানায় একটা ই-মেইল এল, পাঠিয়েছেন সামি কাদরি: 'তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়াটা সাংঘাতিক জরুরি...'

পাহাড়ি পথ বেয়ে উঠবার সময় মাঝে-মধ্যে থামছে শাফুরা, যেন দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছে। আসলে ওর সঙ্গে যে-সব লোকজন উপরে উঠছে তাদেরকে ভাল করে দেখে নিচ্ছে। তাদের মত গায়ে রোদ লাগাতে বা পিকনিক করতে এখানে আসেনি ও।

কাদরি ওকে জানিয়েছেন, ইজরায়েল থেকে সপরিবারে পালাবার জন্য ওর সাহায্য দরকার হবে তাঁর। বলছেন সঙ্গে করে এমন একটা জিনিস নিয়ে আসবেন, জানতে পারলে গোটা মুসলিম বিশ্ব আঁতকে উঠবে।

লোকজন পাশ কাটানোর সময় গ্রিক ভাষায় শুভেচ্ছা জানাচ্ছে শাফুরাকে।

'হ্যালো, হ্যালো...কী চমৎকার দিন, না?'

'সত্যি দারুণ।'

প্রায় সবার কাছেই ন্যাপস্যাক আর পিকনিক বাস্কেট দেখা যাচ্ছে। বাস্কেটগুলো থেকে উপচে পড়তে চাইছে খাবারের প্যাকেট আর ওয়াইনের বোতল। অলিম্পাস পাহাড়ের এদিকটায় উঠে লাঞ্চ খাওয়া দেশী-বিদেশী সব ধরনের ট্যুরিস্টদের কাছেই খুব প্রিয় একটা আকর্ষণ। হয়তো পুরানো ঈশ্বরদের সান্নিধ্য পাওয়ার সুপ্ত সাধ মেটানোর একটা প্রয়াস।

৬০০০ ফুট লেভেলের পর গাছপালা আর ঘাস পিছিয়ে পড়ল। পথ এখানে অসম্ভব খাড়া আর বিপজ্জনক। প্রায় সবাই থামল এখানে, আর থামতে না থামতেই হামলে পড়ল পিকনিক বাস্কেটের উপর।

তাদেরকে এড়িয়ে আরও খানিক উঁচু, দুর্গম আর নিভৃত জায়গায় উঠে এল শাফুরা। একটা ঝরনার পাশে হাঁটু গাড়ল। এই ঝরনা পাহাড়ের সবটুকু গা বেয়ে সেই গালফ অভ সালোনিকায় নেমে গেছে। বহু দূরে হলেও, এখান থেকে উপসাগরটা দেখতেও পাচ্ছে শাফুরা।

ন্যাপস্যাক খুলে প্রথমে একটা সাদা চাদর বের করে বিছাল ও। তার উপর সাজাল ঠাণ্ডা চিকেন, পনির, রুটি আর ফ্লাস্ক ভর্তি কফি। কয়েক মিনিট পর, কেউ ওর উপর নজর রাখছে না নিশ্চিত হয়ে, সোয়েটারের ভিতর থেকে একটা পিস্তল বের করে চাদরটার তলায় গুঁজে রাখল।

অপেক্ষার সময়টা খাওয়াদাওয়া করে কাটাল শাফুরা। দ্বিতীয় বার কফি ঢালছে কাপে, এই সময় পিছন থেকে পাথরে বুট ঘষা খাওয়ার শব্দ ভেসে এল।

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল শাফুরা। পুরানো ট্রাউজার আর উলের ছেঁড়া সোয়েটার পরা এক লোক শাফুরার কাছাকাছি একটা বোল্ডার লক্ষ্য করে ক্লান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে। মুখে আধইঞ্চি লম্বা কাঁচাপাকা দাড়ি। মাথার চুলে অনেকদিন চিরনি বা কাঁচি পড়েনি। লোকটাকে স্থানীয় চাষী বলে মনে হলো শাফুরার। চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে। তবে এই এক সেকেন্ডের দৃষ্টি বিনিময়েই তাঁকে চিনে নিয়েছে শাফুরা।

ওর কাছ থেকে পাঁচ ফুট দূরে, বোল্ডারটার দিকে পিছন ফিরে বসলেন সামি কাদরি।

দু'মিনিট পার হয়ে গেল। শব্দ বলতে বাতাসের বিলাপ আর নীচে থেকে ভেসে আসা বাচ্চাদের হইচই শুনতে পাচ্ছে শাফুরা।

তিন মিনিট পার হতে যাচ্ছে, অবশেষে খুক করে কাশলেন কাদরি। 'তুমি কী সত্যি আমাকে চিনতে পারোনি, শাফুরা?' নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে এসে চাদরের কিনারায় বসলেন।

'চিনলেও, আপনার ছদ্মবেশে কোন খুঁত নেই।' বড় করে

একটা শ্বাস নিল শাফুরা। 'কি ব্যাপার বলুন তো, মিস্টার কাদরি? আপনার ই-মেইলটা এমনই রহস্যে ঠাসা যে ওটা পাবার পর থেকে কৌতূহলে মরে যাচ্ছি আমি।'

'সবই তোমাকে বলব, শাফুরা। তবে তার আগে এক কাপ গরম কফি খাওয়াও আমাকে।'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে শুরু করলেন সামি কাদরি। তাঁর কথা যতই শুনছে, ততই টানটান হয়ে উঠছে শাফুরার স্নায়ু।

সামি কাদরি তাঁর ই-মেইলে কিছু বাড়িয়ে বলেননি। হাসিখুশি, সরল মানুষটার কাছে সত্যিই ভয়ঙ্কর কিছু তথ্য আছে।

কায়রোতে চাকরি করবার সময় দৈবক্রমে সামি কাদরি জানতে পারেন মিশরের কিছু রাজনৈতিক নেতা, সামরিক অফিসার, পদস্থ আমলা আর বড় ব্যবসায়ী ইজরায়েল সরকারের কাছ থেকে প্রতি বছর মোটা অঙ্কের টাকা পাচ্ছে। স্বভাবতই এরকম একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার কেন ঘটছে জানবার খুব কৌতূহল হয় তাঁর। গোপনে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখতে পান, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সাহায্য করতে মিশর সরকারকে কৌশলে বাধা দেওয়াই এই লোকগুলোর মূল কাজ। তা ছাড়াও, বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে মিশরীয় পণ্য ইজরায়েলে পাঠানো, সামরিক তথ্য পাচার, তৃতীয়পক্ষের মাধ্যমে ইজরায়েলি সমরাস্ত্র ক্রয়, ইহুদি বসতিকারীদের পক্ষে জনমত গঠন ইত্যাদি আরও অনেক কাজ করছে তারা।

এ-সব জানবার পর কাদরির মাথায় একটা প্রশ্ন জাগল: ইজরায়েল অশুভ আর অত্যাচারী একটা দেশ; তাকে ঘিরে রেখেছে ছোট-বড় অনেকগুলো মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র, অথচ যুদ্ধ বাধলে প্রতিবার মুসলমানরা হারে আর ইহুদিরা জেতে কেন?

অবশ্য যুদ্ধ যা হয়েছে সবই অনেক আগে। বহু বছর হয়ে গেল ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো আর কোন যুদ্ধই

করছে না। এখানেও বিরাট একটা রহস্যময় প্রশ্ন ওঠে: কেন?

তবে কি বিপুল টাকার বিনিময়ে প্রতিবেশী মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রগুলোর গোপন আনুগত্য কিনে নিয়েছে ইজরায়েল? সেজন্যই কি যুগের পর যুগ কেটে গেলেও ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতা সংগ্রাম সাফল্যের মুখ দেখছে না? ফিলিস্তিনি মুসলমানদের শত্রু কি তা হলে শুধু ইহুদিরা নয়, মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন স্তরের বেশ কিছু ক্ষমতাবান মুসলমানও?

মাতৃভূমির প্রতি দায়িত্ববোধ থেকে আরও তদন্ত চালাবার সিদ্ধান্ত নিলেন কাদরি। এবং যা আশঙ্কা করেছিলেন, তাই সত্যি হলো। ছ'মাসের মধ্যে তিনি মোটামুটি নিশ্চিত হলেন, শুধু মিশর নয়, কম করে ধরলেও দশ-এগারোটা দেশের বহু পদস্থ আমলা, সামরিক কর্মকর্তা, রাজনীতিক আর ব্যবসায়ীকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে ইজরায়েল।

দেশগুলো হলো–সিরিয়া, লেবানন, তুরস্ক, জর্দান, মিশর, সৌদিআরব, ইরান, ইয়েমেন, ওমান, ইউএই ও কুয়েত।

এ-সব দেশের বিশ্বাসঘাতক লোকগুলোকে নিজেদের পক্ষে কাজ করাতে রাজি করিয়েছে ইজরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মোসাদের সাহায্যে।

কাদরি নিশ্চিত হলেন, তারা অর্থাৎ ফিলিস্তিনিরা কখনোই কোন মুসলিম রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে স্বাধীন হতে পারবে না। ইজরায়েল তো বটেই, এই দশটা দেশও আসলে তাদেরকে বাধা দিচ্ছে এবং দেবে।

কাদরি সিদ্ধান্ত নিলেন, এই তথ্য তিনি দুনিয়ার সামনে ফাঁস করে দেবেন। কিন্তু তা করতে হলে নিজের বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ হাজির করতে হবে। অথচ তাঁর কাছে তো অকাট্য কোন প্রমাণ নেই।

এই সময় তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন। কায়রো থেকে তেল আবিবে চলে এলেন কাদরি। এখানে আসবার তিন মাসের মধ্যে

জানতে পারলেন, প্রতিবেশী এক ইহুদি পরিবারের মেয়ে পামেলা তাকে প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেলেছে।

কাদরি স্বভাবতই মেয়েটিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। তাঁর খুব ভাল করেই জানা আছে যে ইহুদি আর মুসলমানদের প্রেম ইজরায়েলে অন্তত সফল হয় না। তা ছাড়া মেয়েটির সঙ্গে তাঁর বয়সের ব্যবধানও অনেক বেশি। তাঁর বিয়াল্লিশ চলছে। আর পামেলার বয়স খুব বেশি হলে পঁচিশ। এদিকে, তাঁর নিজের মেয়ে শায়লা আগামী মাসে পনেরোয় পা দিতে যাচ্ছে।

কিন্তু তিনি এড়াতে চেষ্টা করলে কী হবে, মেয়েটি তাঁর প্রেমে একেবারে উন্মাদিনী হয়ে উঠল। পাশের বাড়ির মেয়ে, ফলে যখন মন চায় তখনই চলে আসে সে। এটা-সেটা রান্না করে খাওয়ায়, টুক-টাক কাজ করে দেয়, মাঝে-মধ্যে আবার গান গেয়ে শোনায়। গলাটা বেশ ভালই বলা চলে।

বাইরে বেরিয়েও শান্তি নেই কাদরির। পামেলা অমনি তাঁর ছায়া হয়ে যায়। দেখা গেল খবর সংগ্রহের জন্য যেখানেই যাচ্ছেন তিনি, সেখানেই পামেলার পরিচিত লোকজন আছে। তারপর জানা গেল আসল ব্যাপারটা।

পামেলার বাবা ইজরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের খুব বড় একজন অফিসার। ওদের অনেক আত্মীয়-স্বজনও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বড় বড় পদে আছে। পামেলা নিজেও বাবার সঙ্গে একই মন্ত্রণালয়ে চাকরি করত, তবে দু'বছর আগে রোড অ্যাক্সিডেন্টে তার স্বামী মারা যাওয়ায় চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে সে।

দেখা গেল পামেলা সঙ্গে থাকায় খবর সংগ্রহ অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে কাদরির জন্য। বিশেষ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর অন্যান্য সাংবাদিকের চেয়ে অনেক আগে জানবার সুযোগ হচ্ছে তাঁর। এই সময়ই তাঁর মাথায় আইডিয়াটা খেলে। দশ-বারোটা মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্রের অন্তত পাঁচশো লোভী

লোককে দলে টেনেছে ইজরায়েল সরকার, তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতায় পৌঁছেছে, তা হলে তো এদের সম্পর্কে একটা ফাইল কোথাও না কোথাও থাকতে বাধ্য। কাজটা যেহেতু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের, ফাইলটাও নিশ্চয় এখানেই কোথাও আছে।

কাদরি উপলব্ধি করলেন, পামেলার প্রতি তিনিও দুর্বল হয়ে পড়ছেন। তারপর একদিন বিষয়টা নিয়ে আলাপ করলেন তাঁরা।

পামেলা বিয়েতেই বেশি উৎসাহী, তবে তা না হলে লিভ টুগেদারেও তার আপত্তি নেই। কাদরি জানতে চাইলেন, বিয়েতে ধর্ম একটা বাধা নয়?

পামেলা যুক্তি দেখাল, মায়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়ার পর বাবা তাঁর খ্রিস্টান প্রাইভেট সেক্রেটারিকে বিয়ে করেছেন, আর মা বিয়ে করেছেন একজন মুসলমান ব্যবসায়ীকে। তাঁরা কেউই তাঁদের ধর্ম পরিবর্তন করেননি।

কাদরি লিভ টুগেদার করতে রাজি নন, কারণ তিনি মনে করেন মেয়ে শায়লার জন্য সেটা একটা খারাপ দৃষ্টান্ত হবে। পামেলাকে তিনি বিয়ে করতে পারেন, তবে নিজের ধর্ম ত্যাগ করে নয়। পামেলা কি কাদরিকে বিয়ে করবার জন্য তার ধর্ম ছেড়ে মুসলমান হতে রাজি?

চিন্তা-ভাবনা করে পামেলা জবাব দিলঃ সে মুসলমান হয়েই কাদরিকে বিয়ে করবে, তবে তা গোপনে এবং বিদেশে গিয়ে।

কাদরির তখন পুরানো সমস্যাটার কথা মনে পড়ল। ভিসা? পামেলা হেসে উঠে আশ্বস্ত করল, তার জন্য ওটা কোন সমস্যাই নয়।

সত্যি কোন সমস্যা হলো না। ইজরায়েল থেকে বেরিয়ে এসে পামেলাকে বিয়ে করলেন কাদরি।

বিয়ের পরপরই বদলে গেল পামেলা। বাবা আর আত্মীয়-স্বজনদের প্রভাব কাজে লাগিয়ে বৈধ-অবৈধ পন্থায় টাকা কামাবার জন্য উঠে পড়ে লাগল সে। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর লোভ দেখে

অবাক হয়ে গেলেন কাদরি। সেই সঙ্গে বিদেশ ভ্রমণের নেশাটাও প্রবল হয়ে উঠল পামেলার। স্বামীর বা নিজের হাতে টাকা আসতে যা দেরি, সরকারী অনুমতি আর ভিসা যোগাড় করে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় প্লেনে ওঠা চাই।

তবে নিজের অজ্ঞাতে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে স্বামী কাদরিকে সাহায্যও করছে পামেলা। কাদরি যখনই চাইছেন তখনই তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে আসছে সে। অনেক সময় সশরীরে গেটে পৌঁছাতেও হয় না তাকে, টেলিফোন করে দিলেই সিকিউরিটি গার্ডরা ভিতরে ঢুকতে দেয় কাদরিকে। ইতিমধ্যে তারা তাঁকে চিনে ফেলেছে, ফলে এখন আর সার্চও করে না।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন সেকশনে ঢুঁ মারলেন কাদরি। তারপর একেবারে হঠাৎ করেই যা খুঁজছিলেন পেয়ে গেলেন।

আশ্চর্যই বলতে হবে। জিনিসটা তাঁর এত কাছে ছিল যে ভাবাই যায় না।

ইজরায়েলের বৈদেশিক নীতি কখন কী বদল হলো জানবার জন্য শ্বশুরের খাস চেম্বারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকেন কাদরি। সেদিনও বসে আছেন। হঠাৎ একটা ফোন এল।

ফোনে কথা বলছেন শ্বশুর, দু'একটা শব্দ শুনেই কাদরি বুঝে ফেললেন, এটাই তাঁর সাবজেক্ট। 'মিশরীয় আর ইরানি বন্ধুরা টাকা পায়নি?...তুরকিদের হিসাবে ভুলভাল হয়েছে?...' ফোনে এই সব কথা বলতে শুনলেন শ্বশুরকে।

ফোন রেখে দিলেন শ্বশুর, কম্বিনেশন লক খুলে ওয়াল সেফ থেকে বের করলেন মোটা একটা ফাইল। কাদরি বুঝলেন, এই ফাইলটায় তাঁর চোখ বুলাতে হবে।

এক হপ্তা পর। স্ত্রী পামেলাকে নিয়ে কাদরি শ্বশুরের খাস চেম্বারে বসে আছেন। তিনি জানেন, আজ শ্বশুরকে ডিপার্টমেন্টাল মিটিঙে উপস্থিত থাকতে হবে।

ঠিক সময় মত কিছু প্রশ্ন করে ইজরায়েল সরকারের পররাষ্ট্র নীতির ব্যর্থতা সম্পর্কে জানতে চাইলেন কাদরি। শ্বশুর লেকচার দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তাঁদের নীতি শতকরা একশো ভাগ সফল।

শুরু করেছেন এক মিনিটও হয়নি, কনফারেন্স রুম থেকে তাঁর ডাক এল। মেয়ে-জামাইকে বসে থাকতে বলে মিটিঙে যোগ দিতে চলে গেলেন ভদ্রলোক।

শ্বশুর চলে যেতেই প্যাড টেনে নিয়ে খসখস করে একটা রিপোর্ট লিখতে শুরু করলেন কাদরি, স্ত্রীর উপস্থিতি সম্পর্কে যেন সম্পূর্ণ বেখেয়াল।

স্বভাবতই নিজেকে নিঃসঙ্গ লাগল পামেলার, সেই সঙ্গে একঘেয়েমির শিকার। পাঁচ মিনিটও কাটল না, স্বামীকে একা বসিয়ে রেখে কী একটা কাজ আছে বলে বেরিয়ে গেল সে।

পামেলা চলে যেতেই চেম্বারের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন কাদরি। বুক পকেটের মোটাসোটা ঝরনা কলমের ভিতর ছোট্ট একটা ক্যামেরা লুকানো আছে। ফাইলটা বের করে একবার চোখ বুলাবেন, তারপর প্রতিটি পৃষ্ঠার ফটো তুলবেন। তালার কমবিনেশন নাম্বার গত হপ্তায় শ্বশুরকে ঘোরাতে দেখবার সময় মুখস্থ করে রেখেছেন তিনি।

ফাইলটা বের করে দুচার পৃষ্ঠায় চোখ বুলাতেই নিশ্চিত হওয়া গেল, এটাই সেটা। কিন্তু সীমিত সময়ের মধ্যে তিনশো চল্লিশটা পাতার ফটো তোলা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে সিদ্ধান্ত নিলেন গোটা ফাইলটাই চুরি করবেন। করলেনও তাই।

শ্বশুর ফিরে আসবার আগেই ফাইলটা বেল্টের সঙ্গে কোমরে আটকে রাখলেন কাদরি।

ফাইলে আসলে কী আছে, বিশদ জানবার জন্য, আবার বিদেশে বেড়াতে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো তাঁকে। তবে তার আগে তিনি ছোট্ট ক্যামেরার সাহায্যে পুরো ফাইলটার

ফটো তুলেছেন। তারপর একদিন সুযোগ করে নিয়ে ফাইলটা আবার শ্বশুরের অফিসে, সেই ওয়াল সেফে রেখে এলেন।

সুযোগ এল দু'মাস পর। 'দা ডেইলি নাইল'-এর হেড অফিস কায়রো থেকে জানানো হলো এক বছরের ট্যুরে সার্বিয়া, আলবেনিয়া, আর বুলগেরিয়ায় যেতে হবে তাঁকে, রাষ্ট্রগুলোর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট করতে হবে।

শুনেই লাফিয়ে উঠল পামেলা আর শায়লা, তারাও যাবে।

শ্বশুরের প্রভাব খাটিয়ে স্ত্রীর পাসপোর্ট-ভিসার ব্যবস্থা করা গেলেও, মেয়ে শায়লার জন্য সরকারী অনুমতি আদায় করা গেল না, অগত্যা বাধ্য হয়ে তাকে স্কুলের বোর্ডিঙে ভর্তি করে দিলেন কাদরি। মেয়েকে বোঝালেন, সামনে তোমার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা, এখন কোথাও বেড়াতে না যাওয়াই উচিত।

বিদেশে এসে খুদে ক্যামেরায় তোলা ফটোগুলো ওয়াশ এবং এনলার্জ করবার পর কাদরির কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, রাষ্ট্র হিসাবে ইজরায়েল কীভাবে টিকে আছে। তালিকায় পাওয়া গেল দশটা দেশের প্রায় সাড়ে তিনশো বিশ্বাসঘাতককে। তাদের নাম, পেশা, পদ, ফরেন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নম্বর, সহযোগিতা করবার ক্ষেত্র ইত্যাদি সব তথ্যই ফাইলবন্দি করা হয়েছে।

উপরি পাওনা হিসাবে পাওয়া গেল এই বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কে ইজরায়েলি ইন্টেলিজেন্স মোসাদের বাৎসরিক রিপোর্ট।

এই পর্যায়ে শাফুরা বাধা দিল কাদরিকে, জানতে চাইল, 'কিন্তু এ-ধরনের বিপজ্জনক একটা আবিষ্কার সম্পর্কে আপনি আমাকে কেন জানাচ্ছেন?'

'জানাচ্ছি, কারণ তুমি একজন স্পাই, তাই,' জবাব দিলেন কাদরি।

রীতিমত একটা ঝাঁকি খেল শাফুরা। 'মানে?'

'বিশ্বাসঘাতক লোকগুলো সম্পর্কে মোসাদের বার্ষিক

রিপোর্টের কথা বললাম না? ওদের সর্বশেষ রিপোর্ট তিনজন স্পাই-এর পরিচয় দিয়ে সাবধান করা হয়েছে, এদেরকে যেন ভুলেও দলে টানবার চেষ্টা করা না হয়, কারণ টাকা দিয়ে এদেরকে কেনা সম্ভব নয়। সেই তিনজনের একজন হলো–বিসিআই-এর অন্যতম এজেন্ট সোহানা চৌধুরী ওরফে সারাহ শাফুরা–তুমি।'

ব্যাপারটা হজম করতে পাঁচ সেকেন্ড সময় নিল সোহানা। তারপর জানতে চাইল: 'বাকি দু'জনকে বাদ দিয়ে এত সব কথা আমাকে বলবার কারণ, মিস্টার কাদরি?'

'তোমাকে আর মাসুদ রানাকে আমি চিনি। অপর লোকটাকে চিনি না। নাগালের মধ্যে এখন শুধু তুমি আছ।'

'এবার বলুন আপনার উদ্দেশ্য কী। আমার কাছে আপনি কী চান?' সরাসরি জানতে চাইল সোহানা।

'এই ভয়ঙ্কর ফাইলটা আমার কাছে থাকায় যে-কোন মুহূর্তে খুন হয়ে যেতে পারি আমি,' বললেন কাদরি। 'আমার স্ত্রী ও মেয়ের জীবনও হুমকির মধ্যে পড়ে গেছে। তাই, সবার আগে, ইজরায়েল থেকে সপরিবারে পালাতে চাই। চাই রাজনৈতিক আশ্রয়। এই কাজে ফাইলটাকে ব্যবহার করতে চাই পাসপোর্ট আর পুঁজি হিসেবে।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করে সোহানা বলল, 'আপনি যে সত্যি সোনার হরিণ খুঁজে পেয়েছেন, তা কি প্রমাণ করতে পারবেন? অন্তত নমুনা হিসেবে একটা নাম বলুন।'

যদিও আশপাশে আর কেউ নেই, তবু চারপাশটা বার কয়েক তীক্ষ্নদৃষ্টিতে দেখে নিলেন কাদরি, তারপর শার্টের পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে সোহানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। 'জানতাম তুমি চাইবে, তাই সঙ্গে করে এনেছি। কাগজটায় সৌদি আরবের এক প্রভাবশালী রাজনীতিকের নাম আছে, তার সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নাম্বার সহ। আর আছে

ইজরায়েলের অনুকূলে তার অপ-তৎপরতার তালিকা।'

কাগজটার ভাঁজ খুলল সোহানা। নামটা দেখেই বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেল। সবাই জানে এই লোক ইজরায়েলের ঘোরতর বিরোধী। তারপর দ্রুত পড়ে গেল ইজরায়েলের পক্ষে কী কী কাজ করেছে সে। তার কুকীর্তির তালিকাটা দীর্ঘ এবং অবিশ্বাস্য। গুরুতর বলে বিবেচিত হতে পারে অন্তত দশটা। তার মধ্যে একটা হলো–সৌদি সেনাবাহিনীর জন্য ইজরায়েলে তৈরি উজি সাব মেশিনগান কিনবার আদেশ দান। তার সুইস অ্যাকাউন্টে গত পাঁচ বছরে জমা পড়েছে পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

দ্বিতীয় কাগজটার ভাঁজ খুলে একেবারে তাজ্জব বনে গেল সোহানা। আবু মুসা নামটা তার পরিচিত। লোকটা মুসলমান নয়, ইহুদি। এই আবু মুসা ইজরায়েলি ইন্টেলিজেন্স মোসাদের একজন পদস্থ কর্মকর্তা। নাম ছাড়া কাগজটায় তার সম্পর্কে কিছুই লেখা নেই, তবে একটা সুইস ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়া হয়েছে। গত তিন বছরে তার অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে পঁয়ষট্টি মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

'এর ব্যাপারটা কী?' কাগজটায় টোকা দিয়ে জানতে চাইল সোহানা।

'তখন মোসাদের বার্ষিক রিপোর্টের কথা বললাম না? রিপোর্টটা তৈরি করে একটা কমিটি। সেই কমিটিতে আবু মুসাসহ মোট সাতজন মোসাদ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ঘুষ ও আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ তোলা হয়েছিল।'

'কারা তুলেছিল?'

'মোসাদেরই কিছু তরুণ অফিসার। তারা অভিযোগের সপক্ষে সাতটা সুইস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নাম্বারও জানায়। কিন্তু পরের বছর কমিটির রিপোর্টে বলা হয়–তদন্ত করে দেখা গেছে, অভিযোগ সত্য নয়। এ-ও বলা হয় যে অভিযোগকারীরা তাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছে।'

'তারমানে অভিযোগ করা হয়েছিল টাকার ভাগ পাবার লোভে। সেটা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করা হয়েছে।'

'ঠিক তাই।'

'আবু মুসাকে নিয়ে প্রায় সাড়ে তিনশো লোক,' বলল সোহানা। 'বাকি সবার কাগজগুলো কোথায়?'

'সে-সব একটা নিরাপদ জায়গায় রাখা আছে, ইজরায়েলের বাইরে।'

'সংগ্রহ করা যাবে সপরিবারে আপনাকে পালাবার সুযোগ করে দিলে?'

'শুধু পালাতে সাহায্য করলে হবে না। আমি রাজনৈতিক আশ্রয় আর আর্থিক নিরাপত্তাও চাই।'

সোহানা চিন্তা করছে। বিসিআই চিফের কাছে জমা দেওয়া রানার একটা রিপোর্টের কথা মনে পড়ে গেল ওর। বেশিদিন আগের কথা নয়, মধ্যপ্রাচ্য ট্যুর করছিল রানা; খবর পেয়ে ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সৌদি আরবের একজন আমীর, শেখ বায়েজিদ সালামাত ওকে নিজের দফতরে লাঞ্চ খাবার দাওয়াত দেন। ভদ্রলোক সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীও বটেন। লাঞ্চ খেতে খেতে তিনি তাঁর একটা সমস্যার কথা বলেন রানাকে।

বেশ কিছুদিন ধরে শেখ সালামাত লক্ষ করছেন, তাঁর নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত অনুসারে সব কাজ হচ্ছে না। তাঁর ভাষায়, তিনি যা করতে চাইছেন তা করতে পারছেন না, নেপথ্যে থেকে কে বা কারা যেন সব এলেমেলো করে দিচ্ছে। সময় করতে পারলে রানাকে তিনি একটু খোঁজ নিয়ে দেখতে অনুরোধ করলেন, সেই সঙ্গে এ-ও বললেন যে রহস্যটা কী জানবার জন্য যতই টাকা লাগুক, তিনি তা খরচ করতে রাজি আছেন।

রানার এই রিপোর্ট বসের কাছ থেকে আরও দু'একজন এজেন্টের সঙ্গে সোহানাও জেনেছে। এই মুহূর্তে ও ভাবছে: কাদরির যে ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছেন আর শেখ সালামাতের

সমস্যা, দুটো একই বিষয়। ও উপসংহার টানল–সৌদি প্রতিমন্ত্রীর সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে এই খাতে খরচ করবার জন্য টাকার কোন অভাব হবে না। উনি দেবেন টাকা, আর বাংলাদেশ দেবে নিরাপত্তা।

'আপনার কাছে যে জিনিস আছে তার গুরুত্ব আমি বুঝি, মিস্টার কাদরি,' অবশেষে বলল সোহানা। 'আমার ধারণা, বিসিআই-এর গ্রিন সিগন্যাল অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে তার আগে প্রতিটি বিষয় বিশদভাবে জানতে হবে আমাকে।'

'হ্যাঁ, বলো, কী জানতে চাও?'

'টাকার অঙ্কটা বলুন।'

'এক কোটি মার্কিন ডলার,. সঙ্গে নতুন আইডেনটিটি –আমাদের তিনজনের জন্যেই।'

'আপনাদেরকে কি ইজরায়েল থেকে বের করে আনতে হবে?'

'হ্যাঁ। আমরা এখন ইজরায়েলের হাইফায় আছি।' পকেট থেকে দক্ষিণ লেবানন আর উত্তর ইজরায়েলের একটা ম্যাপ বের করলেন কাদরি। ভাঁজ খুলে আঙুল রাখলেন ইজরায়েলের বন্দর নগরী হাইফায়, তারপর একটা রেখা টানলেন লেবানন সীমান্ত পর্যন্ত। 'এই জায়গার নাম তাউস।'

'হ্যাঁ।'

'শহরটার ঠিক দক্ষিণে, এই ধরো মাইল আটেক দূরে, লা-খিরাজ নামে ছোট্ট একটা গ্রাম আছে–সর্‌কশ্‌ পর্বত শ্রেণীর কোলে। তুমি কি ওটা খুঁজে বের করতে পারবে?'

সোহানা চিন্তায় পড়ে গেছে। 'আপনি এমন এক দুর্গম জায়গার কথা বলছেন, যেখানে পাহাড়ি ছাগলরা পর্যন্ত চলাফেরা করতে ভয় পায়। তার উপর দু'দেশের সীমান্তরক্ষীরা তো আছেই।'

'হ্যাঁ. জানি; তোমাকে পুরুষ এজেন্টদের সাহায্য নিতে

হবে।'

'প্রশ্ন নারী বা পুরুষের নয়, ওই এলাকা সম্পর্কে বিশদ ধারণার।' মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সোহানা; খচ্ করে কিছু একটা বিঁধবার অনুভূতি নিয়ে মাসুদ রানার কথা মনে পড়ে গেছে ওর। এ-ধরনের অপারেশনে ওকেই সবচেয়ে বেশি মানায়। কিন্তু রানা এখন কবীর চৌধুরীকে নিয়ে মহাযন্ত্রণায় দিন কাটাচ্ছে, কোনদিকে তাকাবারও সময় নেই।

'তা বটে,' একমত হলেন কাদরি।

'ওদিকের এক সাবেক গোত্রপ্রধানকে চিনি আমরা, নাম আবদাল শাইখ।' রানার কথা মন থেকে সরিয়ে বাস্তবে ফিরে এল সোহানা।

'মুসলমান? তা হলে তো খুবই ভাল হয়।'

'লেবাননে সে থাকে না। স্মাগলার তো, তার আসল আস্তানা গ্রিসে–গ্রিসের সেরেসে। এর আগেও এ-ধরনের অপারেশনে তাকে আমরা কাজে লাগিয়েছি।'

'একজন স্মাগলার...তাহলে তো তাকে বিশ্বস্ত বলা যায় না।'

'আবদাল শাইখ চোর, স্মাগলার এবং খুনী হতে পারে–তবে বিশ্বস্ত। তাকে আপনি একজন সৎ ক্রিমিন্যাল বলতে পারেন। সে গরিব কোন মানুষের জিনিস চুরি করে না, তার হাতে ভাল কোন মানুষ খুন হয় না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কাদরি বললেন, 'তুমি যখন সার্টিফিকেট দিচ্ছ, কাজেই আমার কোন আপত্তি নেই। তা হলে এবার বাকিটা বলি।

'লা-খিরাজের তিন কিলোমিটার দক্ষিণে, পাহাড়ের গায়ে রাখালদের একটা কুঁড়ে আছে। খুবই পুরানো ওটা, তবে জানালা আর শাটার নতুনই বলা চলে, হলুদ রঙ করা। ওই রঙের জন্যেই শাটারগুলো অনেক দূর থেকে দেখা যায়।'

সোহানা চিন্তিত। 'যদি তুষারঝড় না হয়। জায়গাটা প্রায় ছয় হাজার ফুট ওপরে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন কাদরি। 'ঝুঁকি না নিয়ে তো উপায়ও নেই আমাদের।' ম্যাপটা ভাঁজ করে সোহানার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। 'আমি আর আমার স্ত্রী পামেলা দু'জনেই স্কিতে ভাল। শায়লাও স্কি করতে পারে, তবে ওরকম দুর্গম জায়গায় কখনও করেনি। ওর বোধহয় সাহায্য লাগবে। তোমার লোককে সেটা জানিয়ে রাখতে হবে।'

'হেডকোয়ার্টার থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেলে আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব,' বলল সোহানা। 'যোগাযোগের ঠিকানা?'

'ম্যাপের উল্টোপিঠে দেয়া আছে,' বললেন কাদরি। 'যদি গ্রিন সিগন্যাল পাও, কিন্তু যোগাযোগ করে আমাকে পেলে না, তা হলে কী করবে?'

'কেন পাব না?'

'কেউ বোধহয় কিছু সন্দেহ করেছে। দেখতে পাই না, তবে কেউ পিছু নেয় বলে সন্দেহ হয়। যদি গা ঢাকা দিতে হয়, তা হলে?'

'আপনিই বলুন কী করব তখন।'

'আমি আমাদের শেডিউল জানিয়ে দিই তোমাকে,' বললেন কাদরি। 'তা হলে যোগাযোগ না ঘটলেও তোমরা তৈরি থাকতে পারবে।'

'বেশ, বলুন।'

'আজ থেকে ঠিক ত্রিশদিন পর পাহাড়ের ওপর, রাখালদের ওই কুঁড়েতে পৌঁছাব আমরা। তারপর আমাদেরকে নিরাপদ কোথাও পৌঁছে দেয়া শাইখের দায়িত্ব। শাইখ খান যদি না আসে তাহলে বুঝে নেব গ্রিন সিগন্যাল পাওনি তুমি। সেক্ষেত্রে কী করব সেটা এখন ভাবব আমি।'

চাদরের পাশে সিধে হলেন ফিলিস্তিনি জার্নালিস্ট সামি কাদরি। 'গুডবাই, মাই ডিয়ার লেডি।' ঘুরে ফিরতি পথ ধরলেন, একটু পরই হারিয়ে গেলেন পাহাড়ের বাঁকে।

আরও প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করল সোহানা। ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। অ্যাথেনা অ্যাভিনিউয়ে নেমে এসে একটা ফোন-ফ্যাক্সের দোকানের সামনে মার্সিডিজ থামাল ও।

বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায় কোড করা একটা টেলেক্স পাঠাতে সময় লাগল প্রায় আধ ঘণ্টা। দোকানটা থেকে বেরিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত গাড়ি চালাল সোহানা। আঠারো মাইল দক্ষিণে এসে অ্যাথেন্স হাইওয়ে ছেড়ে বাঁক নিল পুবদিকে, গন্তব্য সেরেস। আবদাল শাইখের সঙ্গে আলাপটা আজই সেরে ফেলতে চায় ও।

দুই

'দূর ছাই!' বলে খটাস করে টেলিফোনের রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখল সোহানা।

প্রথমবার সেরেসে এসে শাইখের দেখা পায়নি ও, কেউ বলতে পারেনি কোথায় আছে সে। তার আস্তানা থেকে দুটো ফোন নম্বর দেওয়া হয় ওকে; এক হপ্তা পর আবার সেরেসে এসে ওই নম্বরে খোঁজ করতে বলা হয়। অপরপ্রান্তের মেয়েটিকে সোহানা একটা মেসেজ দিয়ে বলেছিল শাইখকে যেন জানানো হয়।

দ্বিতীয়বার সেরেসে আসবার পর আটচল্লিশ ঘণ্টা পেরিয়ে যাচ্ছে, অথচ এখনও শাইখের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছে না ও। হোটেলে উঠে প্রায় প্রতি ঘণ্টায় চেষ্টা করছে, কিন্তু দুটো ফোনের একটাও কেউ ধরছে না।

আরেকবার রিসিভারের দিকে হাত বাড়িয়েছে সোহানা, মৃদু

টোকা পড়ল দরজায়।

হাতে পিস্তল, স্পাই হোলে চোখ রেখে অত্যন্ত সুদর্শন এক তরুণকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। দরজা খুলে জানতে চাইল, 'কী চাই?'

'ভেতরে ঢুকতে দিন,' বলল তরুণ, বয়স হবে তেইশ কি চব্বিশ। সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে করিডরের দু'দিক বারবার দেখে নিচ্ছে। 'একটা মেসেজ আছে।'

সরে দাঁড়াল সোহানা। ছেলেটি ভিতরে ঢুকতে দরজা বন্ধ করে দিল। 'কে তুমি?'

'হামদুন বারিক,' বলল তরুণ। 'আপনি মিস সারাহ শাফুরা, এটা প্রমাণ করুন, তা না হলে মেসেজটা দিতে পারছি না।'

টেবিলের দেরাজ খুলে পাসপোর্ট বের করল সোহানা, ছুঁড়ে দিল তরুণের দিকে।

পাসপোর্ট লুফে নিয়ে খুলল হামদুন বারিক। তারপর সেটা বিছানার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ফাতেমা নামে কাউকে চেনেন?'

'না। কেন?'

'ফাতেমা আমার খালা। তিনিই আমাকে পাঠালেন।'

'থেমো না, কী বলতে এসেছ তাড়াতাড়ি বলো,' তাগাদা দিল সোহানা।

'আবদাল শাইখ আমার খালু।'

'সে কোথায়?' সোহানার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হলো।

'সেটা আমার খালা আপনাকে জানাবেন। আমি শুধু বলতে এসেছি কোথায় তাঁকে পাওয়া যাবে।'

'কোথায়?'

'তার আগে আরেকটা কথা,' বলল বারিক। 'খালা বলে দিয়েছেন টাকার অঙ্ক আরও না বাড়ালে খালু কাজটায় বোধহয় হাত দিতে পারবেন না।'

রাগ হলেও নিজেকে সামলে রাখল সোহানা। শাইখের টেলিফোন নম্বর পাওয়ার সময় অপরপ্রান্তের মেয়েটিকে ও বলেছিল, লোক পাচারের একটা কাজ করে দিয়ে পঁয়ত্রিশ হাজার হাজার মার্কিন ডলার কমানো যায়, সুযোগটা শাইখ যেন হাতছাড়া না করে। কাজটা কী, বিশদ কিছু না জেনেই স্ত্রী আর স্ত্রীর বোনপোকে দিয়ে টাকার অঙ্ক বাড়াবার প্রস্তাব পাঠিয়েছে শাইখ। 'ঠিক আছে। ফাতেমা কোথায়?'

'আমিই তাঁর কাছে নিয়ে যাব আপনাকে। আপনি স্বপ্নের পথ নামে চৌরাস্তাটা চেনেন?'

চেনে সোহানা। সারি সারি অন্ধকার বার, নাইটক্লাব আর ব্রথেলের সমষ্টি ওই স্বপ্নের পথ। মাথা ঝাঁকাল ও।

'কিউপিড বার,' বলে দরজার দিকে পা বাড়াল হামদুন বারিক। 'আমি বেরিয়ে যাবার পাঁচ মিনিট পর আপনি বেরুবেন। আমি আপনাকে অনুসরণ করব।'

আধুনিক সেরেস বেশ সাজানো-গোছানো। পপলার গাছের নীচে রাস্তাগুলো চওড়া আর পরিচ্ছন্ন। এক-দু'মাইল পর পর একটা করে পার্ক বা বাগান, ভিতরে সবুজ লন আর নৌকা চালাবার মত বড় লেক।

ট্যাক্সি থামল পুরানো শহরের প্রবেশ পথে। ভাড়া মেটাবার সময় চোখের কোণ দিয়ে সোহানা দেখল রাস্তার ওপারে একটা ভেসপা থামল। ফটক দিয়ে হেঁটে ভিতরে ঢুকল বারিক।

তার পিছু নিল সোহানা।

কিউপিড বার অন্ধকার এক গলির ভিতর। বারে না ঢুকে দালানটার পিছনের দরজা দিয়ে বারিক যেন একটা গোলক ধাঁধায় ঢুকল। করিডর আর প্যাসেজ ধরে অন্তত দশটা বাঁক ঘুরবার পর একটা কামরায় ঢুকল সে। এখানেই সোহানার জন্য অপেক্ষা করছে আবদাল শাইখের স্ত্রী ফাতেমা শাইখ। মহিলার বয়স হবে পঁয়ত্রিশ। চোখ-মুখ দেখে মনে হলো সন্ত্রস্ত।

'বারিক আপনাকে সব জানিয়েছে?' পরিচয় পর্ব শেষ হতেই জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ, শাইখ আরও টাকা চান।'

মাথা ঝাঁকাল ফাতেমা। 'চাইবার কারণ আছে। তার বিপদ।'

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল সোহানা। 'কী বিপদ?'

হাত দুটো তুলে বাতাসে আঙুলগুলো নাচাল ফাতেমা। 'কে জানে কী বিপদ। আপনাদের শাইখের তো বিপদের কোন শেষ নেই। ও-সব থাক। টাকাটা বাড়াচ্ছেন তো?'

'কত?'

'পচাঁত্তর হাজার। এর কমে পারা যাবে না।'

এতগুলো টাকার ব্যাপার, বসের অনুমতি ছাড়া কী করে রাজি হয় সোহানা। তবে পরক্ষণে চিন্তা করল, একশো একটা দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, এমনকী নতুন একটা বিপদে জড়িয়ে পড়লেও, সারি সারি ইজরায়েলি আর লেবাননী পাহাড় টপকে কাদরি পরিবারকে একমাত্র আবদাল শাইখই পার করে আনতে পারবে। 'ঠিক আছে,' ঝুঁকি নিয়ে পঁচাত্তর হাজারেই রাজি হয়ে গেল সোহানা।

'শাইখকে ধরবার জন্যে সেরেস পুলিশ আমাকে খুঁজছে,' বলল ফাতেমা। 'হয়তো এই বাড়ির ওপরও নজর রাখছে তারা। আপনি পথ চিনে একা বেরিয়ে যেতে পারবেন তো?'

মনে মনে হাসল সোহানা। ভাগ্যিস কখন কোথায় বাঁক নিয়েছে সব মনে গেঁথে নিয়েছিল। 'পারব। কিন্তু শাইখকে কোথায় পাব বলছেন না যে?'

'একটা ট্যাক্সি নিয়ে ড্রোমেনা পার্কে যাবেন। পার্কটাকে ঘিরে পুরো এক চক্কর হাঁটবেন। শাইখ আড়াল থেকে দেখে নিশ্চিত হবে আপনাকে কেউ অনুসরণ করছে কি না। পার্কের উত্তর-পশ্চিম কোণে তিনটে পাবলিক কল বক্স আছে। আপনি মাঝখানেরটায় ঢুকবেন। এবার যান।'

*

ফোনটা বাজতেই ছোঁ দিয়ে রিসিভার তুলল সোহানা। 'শাইখ?'

'ম্যাডাম শাফুরা! কেমন আছেন? আমাদের হিরো মাসুদ রানা কেমন আছেন?'

'আমাদের কথা বাদ দাও। তোমার হয়েছেটা কী? তুমি আমার মেসেজ পাওনি?'

'আমার যা হয় তাই হয়েছে—পুলিশী ঝামেলা। এবারেরটা বেশ বড়ই বলতে হবে।'

আবদাল শাইখের কণ্ঠস্বর কেমন যেন কাঁপা-কাঁপা লাগল সোহানার কানে। শাইখ যেন ভয় পেয়েছে। অথচ ভয় পাওয়ার বান্দা সে নয়। 'কী হয়েছে খুলে বলো আমাকে।'

'ব্যাপারটা ঘটেছে আপনার মেসেজ পাবার পর। কেউ আমাকে ইঁট মেরেছিল, কাজেই আমাকে পাটকেল ছুঁড়তে হয়েছে। কর্তৃপক্ষ এটাকেই বলছে খুন।'

'সর্বনাশ!' সোহানার নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে এল শব্দটা।

'দুর্ভাগ্যক্রমে, এই ঘটনার সাক্ষীও আছে দু'জন। দু'জনেই আবার পুলিশ।'

'পাটকেলটা পরে মারলে হোত না? তুমি খুব ভাল করেই জানো যে জরুরি কোন কাজ ছাড়া আমরা তোমার সাহায্য চাই না।'

'না, ম্যাডাম শাফুরা, অপেক্ষা করবার উপায় ছিল না। হয় আমাকে মরতে হোত, নয়তো ওদেরকে।'

'ওহ্, গড! ক'জন?'

'তিন। নিশ্চিত থাকুন, ম্যাডাম, এই শাস্তি ওদের প্রাপ্য ছিল। চোরাচালান থেকে পাওয়া লাভ চার ভাগের বদলে তিন ভাগ করছিল ওরা। আমি বঞ্চিত হচ্ছিলাম।'

'তাই বলে পুলিশের সামনে তাদেরকে তোমার খুন করতে হবে?'

'ভুল হয়ে গেছে, মানছি।'

সোহানার মাথার ভিতর চিন্তার ঝড় বইছে–নতুন নতুন প্ল্যান তৈরি হচ্ছে, বাতিল হতেও সময় লাগছে না; যাচাই-বাছাই চলছে বিরতিহীন। অপারেশন গুডবাই-এর জন্য আবদাল শাইখের কোন বিকল্প নেই, বিশেষ করে এত অল্প সময়ের নোটিশে।

'ম্যাডাম কিছু বলছেন না।'

'আমি ভাবছি।'

'তা ভাবুন। তবে একটা কথা। এর আগেও যখন আপনাদের কোন কাজ হাতে নিয়েছি, প্রায় প্রতিবারই কোন না কোন কেসে পুলিশ আমার পিছনে আঠার মত লেগে ছিল। পার্থক্য শুধু, আপনারা তা জানতেন না।'

'হুম।'

'তা ছাড়া, আমি কখনও আপনাদেরকে হতাশ করিনি।'

'না, তা করোনি,' স্বীকার করল সোহানা। 'ঠিক আছে, এবার পারিশ্রমিকের কথা বলো।'

'আমার দ্বিতীয় পক্ষ পঁচাত্তর হাজার তো বলেইছে। এখন আপনি শুধু রাজি হলেই হয়।'

'হলাম।'

'গুড। এবার বাম দিকে তাকান, ম্যাডাম। ডক-এর আলো চোখে পড়ছে?'

'হ্যাঁ।'

'ওখান থেকে নৌকা ভাড়া করুন, বৈঠা চালিয়ে লেকটা আড়াআড়ি পার হন। একটা জলপ্রপাত দেখতে পাবেন। ওটার ভিতর দিয়ে এসে টানেলে ঢুকবেন। ওখানে থাকব আমি।' যোগাযোগ কেটে দিল শাইখ।

ডকে এসে সোহানা দেখল অনেকেই নৌকা ভাড়া নিয়ে লেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জিনস আর শার্ট পরে থাকায় নৌকা চালাতে ওর কোন সমস্যা হলো না। জলপ্রপাতটা লেকের অন্ধকার দিকটায়,

তাই এদিকে কেউ আসছে না। জ্যাকেটের কলার উপরে তুলে ঘাড় ঢাকল ও। জলপ্রপাতের মোটা ধারার ভিতর দিয়ে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

জলপ্রপাত থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসেনি, এই সময় অন্ধকার চিরে দিল একটা পেনসিল টর্চের আলো।

'এদিকে, ম্যাডাম শাফুরা। নৌকা থেকে নামার সময় সাবধান কিন্তু। এদিকের পাথর খুব পিছলা।'

নৌকা থেকে নেমে প্রকাণ্ডদেহী আবদাল শাইখের পাশে একটা পাথরের উপর বসল সোহানা, পেনসিল টর্চটা ওদের মাঝখানে। শাইখের আকারটাই এমন যে যাই সে পরুক, মনে হয় এই বুঝি ছিঁড়ে গেল। তার ঘাড়টা ছোট, গালে কলপ লাগানো দাড়ি, চোখ দুটো যেন দুনিয়াদারির বেহাল অবস্থা দেখে সারাক্ষণ বিদ্রূপের হাসি হাসছে।

'আমার গোপন আস্তানায় আপনাকে স্বাগতম, ম্যাডাম শাফুরা। বলুন, আমার জন্যে কী প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন আপনি।'

গুহার ভিতরটা দ্রুত একবার দেখে নিল সোহানা। 'আমি তো কোন নৌকা দেখলাম না। তুমি এখানে এলে কীভাবে?'

'গুহার পিছনে একটা ব্লোহোল আছে–গর্ত আর কি। আমি যখন পুঁচকে চোর ছিলাম, চুরি করা জিনিস-পত্র এখানে এনে লুকিয়ে রাখতাম। তাড়াতাড়ি শুরু করুন, ম্যাডাম। সময়টা আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।'

পরিস্থিতি এবং করণীয়, সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল সোহানা। সবশেষে ফিলিস্তিনি রিপোর্টার সামি কাদরির কাছ থেকে পাওয়া ম্যাপটা বের করে জায়গাটা দেখাল–হলুদ শাটার লাগানো কুঁড়েটা ঠিক কোন জায়গায় পাওয়া যাবে।

'দুঃসংবাদ,' বিড়বিড় করল শাইখ।

'কেন?'

'ওখানকার আবহাওয়া কখন কেমন থাকে কেউ বলতে পারে

না। আমাদেরকে টপকে আসতে হবে সবচেয়ে উঁচু চূড়া। তা ছাড়া, পথে কয়েকটা বিপজ্জনক গিরিখাদও পড়বে। সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেবে সীমান্ত রক্ষীরা। মেয়েটা ছোট বলছেন?'

'ছোট মানে, পনেরো-ষোলো বছর বয়স।'

'সঙ্গে কিছু ইকুইমেন্ট রাখতে হবে। আরেকজন লোকও দরকার হবে।'

'বিশ্বাস করা যায় এমন কাউকে চেনো?'

'কেন চিনব না, ইজরায়েল আর লেবাননের ওই সব এলাকায় আমি সর্দারি করেছি না! এবার পেমেন্টের সিস্টেম নিয়ে...'

'জুরিখ ব্যাঙ্ক,' বলল সোহানা, হাতব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল। 'এই হলো অ্যাকাউন্ট নম্বর। তোমার কোড নেম হলো—গুডবাই। কাল সকালে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার জমা পড়বে।'

'আর বাকি টাকা?'

'অ্যাথেন্সে নিয়ে এসে ওদেরকে তুমি আমার হাতে তুলে দেয়ার পর পাবে ওটা।

'এই কাদরি পরিবার। নিশ্চয়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তারা। পঁচাত্তর হাজার মার্কিন ডলার বিরাট টাকা।'

'ওদের গুরুত্ব শুধু বেঁচে থাকলে, শাইখ। মরে গেলে এক ড্রাকমাও দাম নেই। আরও একটা কথা মনে রেখো—ওদের কিছু হলে তুমি কিন্তু বাকি টাকা পাবে না।'

'মনে থাকবে, ম্যাডাম, মনে থাকবে।'

এতদিনে সামি কাদরির অপেক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই শুরু হবে ব্যাপারটা।

আগেই দরখাস্ত করা হয়েছিল, 'দা ডেইলি নাইল'-এর হেড অফিস কায়রো থেকে এক হপ্তার ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে—সর্কশ্ পর্বত শ্রেণীতে সপরিবারে স্কি করতে যাবেন কাদরি। ইজরায়েল

সরকারের অনুমতি পেতেও খুব একটা অসুবিধে হয়নি।

টপ সিক্রেট ফাইল থেকে পাওয়া সমস্ত তথ্য কোড-এ রূপান্তরিত করেছেন তিনি, তারপর সেই কোডের মাইক্রোফিল্ম তৈরি করে ইজরায়েল থেকে বহু দূর অন্য একটা দেশে লুকিয়ে রেখে এসেছেন। জিনিসটা কোথায় আছে তা শুধু একা তিনিই জানেন। তবে একটা কাগজে সাংকেতিক ভাষায় লোকেশনটা টুকে রেখেছেন।

এই সাংকেতিক ভাষা বা সাইফার ভাঙবার সূত্র থাকছে একটা প্রজাপতির ডানায়।

প্রজাপতিটা আসলে একটা উল্কি, আঁকা হয়েছে মেয়ে শায়লার পিঠে—ডানদিকের শোল্ডার ব্লেডের উপর।

গত ছ'মাস ধরে ধীরে ধীরে মেয়েকে সব বুঝিয়েছেন কাদরি। প্যালেস্টাইন একটা নরককুণ্ড, মুসলমানদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে কোনদিনই এই ভূখণ্ড স্বাধীন হতে পারবে না; যারা বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাদের মুখোশ খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন তিনি, বিনিময়ে নগদ এক কোটি মার্কিন ডলার পাবেন, পাবেন সবার জন্য নতুন আইডেনটিটি আর নিরাপদ আশ্রয়। বোকা ছাড়া এই সুযোগ কেউ ছাড়ে? তবে না, পামেলাকে এখনই কিছু বলা চলবে না।

আব্বুর এই কথায় সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছে শায়লা। সৎ মাকে পছন্দ করে না সে।

তাউস লা-খিরাজ ট্রেন সময়মত ছাড়ল আর পৌঁছাল। নিজের শান্তভাব লক্ষ করে কাদরি নিজেই বিস্মিত। ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে এসে উঠলেন।

এই মুহূর্তে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দূর পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছেন কাদরি, ভাবছেন সর্বশেষ সমস্যাটার কথা: স্ত্রী পামেলাকে এবার সব জানাতে হবে।

ইতিমধ্যে মেয়েকে নীচের ডাইনিং রুমে নাস্তা খেতে পাঠিয়ে

দিয়েছেন কাদরি। স্ত্রীকে বুঝিয়ে রাজি করানোর জন্য একা থাকা দরকার তাঁর।

ধর্ম বদল করাটা আসলে বেকায়দায় পড়ে, পামেলা ইহুদিই রয়ে গেছে, এটা ভালই বোঝেন কাদরি। তবে এ-ও উপলব্ধি করেন যে স্ত্রী তাঁকে সত্যি ভালবাসে। এই ভালবাসার কাছেই আবেদন জানাবেন তিনি–ইজরায়েল ছেড়ে অন্য কোন দেশে স্বামীর সঙ্গে প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাস করবে সে।

ঘুরে স্ত্রীর দিকে তাকালেন কাদরি। কাপড়চোপড় পরছে পামেলা। সন্দেহ নেই, পাগল করা রূপ তার। রূপ আর যৌবন আরও বহু বছর অটুট থাকবে ওই শরীরে। 'ঘড়ি আর আঙটিগুলো রেখে যেয়ো না।'

'কী?'

'বলছিলাম গহনাগুলো ব্যাগে ভরে নাও।'

'স্কি করতে যাব গহনা নিয়ে? দেখো কাদরি, বোকার মত কথা বোলো না।'

'পামেলা,' এগিয়ে আসছেন কাদরি। 'এখানে বসো, এই বিছানার ধারে। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'তোমার কী হয়েছে বলো তো? কিছু একটা তো নিশ্চয়ই হয়েছে। হাইফা ছাড়ার পর থেকেই কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে তোমার আচরণ।'

'বসো।' স্ত্রীর হাত দুটো শক্ত করে ধরে ধীরে ধীরে বললেন সব।

প্রথমে পামেলার চেহারায় আহত বিস্ময় আর অবিশ্বাস ফুটল। তারপর, ধীরে ধীরে, সরু হলো তার চোখ; রাগে নাকের ফুটো বড় হয়ে গেল। কাদরি যখন তার বক্তব্য শেষ করে এনেছেন, পামেলার হাত দুটো কাঁপতে শুরু করল। তারপর দেখা গেল তার গোটা শরীরই থরথর করে কাঁপছে। 'তুমি একটা পাগল, কাদরি! বদ্ধ উন্মাদ!'

কাদরি বিমর্ষচিত্তে উপলব্ধি করলেন, পামেলা তার সঙ্গে যাবে এই আশা করাটা তাঁর ভুল হয়েছে। 'তুমি আমাকে ভালবাস, পামেলা,' বললেন তিনি। 'তুমি বিলাসিতা পছন্দ করো। ভেবে দেখেছ, এক কোটি মার্কিন ডলার দিয়ে কত কী করা যায়?'

'কিন্তু এ তো বিশ্বাসঘাতকতা! এর মানে, তুমি ইজরায়েলের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারোনি! তা যদি না-ই পারবে, তা হলে আমাকে বিয়ে করতে রাজি হলে কেন?'

'বিয়ের সঙ্গে ইজরায়েলের অস্তিত্ব মেনে নেয়ার কী সম্পর্ক?'

'কেন, তুমি একটা ইহুদি পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করোনি?'

'কিন্তু সে মেয়ে তো আমার শর্ত মেনে নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।'

'তুমি খুব ভাল করেই জানো যে আসলে আমি মুসলমান হইনি।' চোখে তীব্র ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে আছে পামেলা।

'তর্ক করে কোথাও পৌঁছানো যাবে না,' বললেন কাদরি। 'তুমি যদি না যাও, আমি শায়লাকে নিয়ে চলে যাচ্ছি।'

'এতই সহজ ভেবেছ? ভেবেছ তোমাকে ইজরায়েলের এত বড় সর্বনাশ করতে দেখেও চুপ করে বসে থাকব আমি?' লাফ দিয়ে সিধে হলো পামেলা, ছুটল টেলিফোনের দিকে।

কাদরিও লাফ দিলেন, তার পথ আটকাবেন।

ছিটকে সরে গিয়ে টেবিল থেকে একটা গ্লাস তুলল পামেলা, ছুঁড়ে মারল কাদরির দিকে। দ্রুত সরে গিয়ে মাথাটা বাঁচালেন কাদরি। পরমুহূর্তে হিংস্র বাঘিনীর মত তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পামেলা।

শুরু হলো ধস্তাধস্তি। মরিয়া হয়ে ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে স্বামীর উরুসন্ধিতে মারতে চাইছে পামেলা। এক সুযোগে দুই হাতে তার গলাটা টিপে ধরলেন কাদরি। তারপর যখন অনুভব করলেন স্ত্রী নড়ছে না, তাঁর সংবিৎ ফিরে এল।

পামেলা মারা যায়নি, তবে হয়তো একটু পরই শেষ নিঃশ্বাস

ত্যাগ করবে। কাদরি কোন ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। বিছানার চাদর ছিঁড়ে ফালি করলেন, সেগুলো দিয়ে খুব ভাল করে বাঁধলেন তাকে। মুখটাও বাঁধলেন, তার আগে ভিতরে গুঁজে দিলেন একটা রুমাল। তারপর পারকা আর গ্লাভস নিয়ে বেরিয়ে এলেন সিটিং রুমে।

হোটেলের স্যুইট থেকে বেরিয়ে এসে দরজায় 'ডু নট ডিসটার্ব' লেখা সাইনটা ঝুলিয়ে দিলেন কাদরি, তারপর তালায় চাবি ঘোরালেন।

দশ মিনিট পর। মেয়ে শায়লাকে নিয়ে স্কি লিফট-এর দিকে হাঁটছেন তিনি।

'কিন্তু আব্বু, এক লোক বলছিল পাহাড়ে ঝড় উঠতে পারে আজ।'

'এসো, সাবধানে থাকব আমরা।'

'উনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন না?' পামেলার কথা জিজ্ঞেস করছে শায়লা, বাধ্য না হলে তাকে সে মা বলে ডাকে না।

'না, আজ নয়।' টিকিট কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়ালেন কাদরি।

'ক'টা?'

'দুটো।'

'কতটা ওপরে?'

'সবচেয়ে উঁচুতে...একেবারে টপ স্টেশনে।'

তুষার পড়ছে বড় বড় কণায়, ওদের কাঁধে জমে স্তূপ হচ্ছে। দৃষ্টিসীমা এখনও ভাল, তবে শাইখ জানে পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে। পাহাড়ি লোক সে, জীবনের বেশির ভাগ সময় ছয় হাজার ফুটের উপরে কাটিয়েছে।

'সর্দার দেখছি যমের বাড়ি নিয়ে চলেছেন আমাকে,' পাশ থেকে মন্তব্য করল পাপা বোকাচি। ছোটখাট, তবে শক্ত-সমর্থ

লোক সে।

ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে স্কি আর ইকুইপমেন্ট প্যাক পিঠের এক দিক থেকে আরেক দিকে চাপাল শাইখ। 'এতক্ষণে তো কুঁড়েটার কাছাকাছি পৌঁছে যাবার কথা। আশা করি আগুন জ্বেলেছে ওরা। ফিরতি পথ ধরার আগে হাড়গুলো একটু গরম করে নিতে হবে।'

'এরকম তুষার যদি পড়তেই থাকে, আমরা স্কি ব্যবহার করতে পারব না,' বিড়বিড় করল পাপা বোকাচি। 'স্নো শু পরে হাঁটতে হবে আরও তিনদিন।'

'চুপ কর, ব্যাটা উজবুক!' ধমক দিল শাইখ। 'তোকে কী আরামে পায়চারি করার জন্যে পাঁচ হাজার ডলার দিচ্ছি?'

আরও মাইলখানেক চুপচাপ হাঁটল ওরা। তারপর ধোঁয়া দেখতে পেল শাইখ। 'ওই তো!'

খানিকটা বাম দিকে ঘুরে দুশো গজ পেরিয়ে এল ওরা, ছোট একটা চূড়া টপকাল, তারপর নীচে দেখতে পেল হলুদ শাটার লাগানো পুরানো কুঁড়েটা।

ঢাল বেয়ে নীচে নামবার সময় কাঁধের রাইফেলটা নামিয়ে হাতে রাখল বোকাচি। শাইখ তার ভারী কোট আর জ্যাকেটের তলা থেকে একটা আমেরিকান কোল্ট ·৪৫ বের করে চেম্বারে একটা শেল ভরল। সেফটি অফ করে ঢুকিয়ে রাখল শোল্ডার হোলস্টারে।

কুঁড়ের দরজায় একা পৌঁছাল শাইখ। একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকে কাভার দিচ্ছে বোকাচি।

দরজায় হালকা ঘুসি মারল শাইখ। পরপর তিনবার।

কবাট সামান্য ফাঁক করে কাদরি জানতে চাইলেন: 'কে?'

'আমি এক ভদ্রলোককে খুঁজছি।'

'নাম?'

'গুডবাই।'

'আপনার নাম?'

'আবদাল শাইখ।'

দরজা পুরোপুরি খুলে গেল। 'ভেতরে আসুন, আবদাল শাইখ। আমি গুডবাই।'

স্যাৎ করে কুঁড়ের ভিতর ঢুকে পড়ল শাইখ, পিছু নিয়ে বোকাচিও। একটাই ঘর, তিন সেকেন্ডে সব দেখা হয়ে গেল শাইখের। 'আপনারা দু'জন কেন?' জানতে চাইল সে। 'আমি তো জানি তিনজন আসবেন।'

উত্তর দেওয়ার সময় কাদরির অন্যদিকে তাকিয়ে থাকাটা শাইখের ভাল লাগল না। 'আমার স্ত্রী...আমার স্ত্রী আসতে পারেননি।'

'কেন আসতে পারলেন না?'

'সেটা আপনার কোন ব্যাপার নয়।'

গালে হাত দিয়ে একটা কম্বলের উপর বসে রয়েছে শায়লা। কিছুটা বিষণ্ন আর অন্যমনস্ক।

'আপনারা খেয়েছেন?'

'না, ব্রেকফাস্টের পর আর কিছু খাওয়া হয়নি।'

একটা প্যাক খুলল শাইখ। 'ঠাণ্ডা তাড়াবার জন্যে আমাদের সবাইকে পেট ভরে খেতে হবে আর ঘুমাতে হবে। সন্ধে হতে এখনও ছ'ঘণ্টা বাকি। ততক্ষণ আমরা ঘুমাব।'

'না...সেটা ঠিক হবে না...' শুরু করেও থেমে গেলেন কাদরি, ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছেন।

'হ্যাঁ, কী বলবেন বলুন!' তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে শাইখ।

'আমরা অতক্ষণ দেরি করব না,' বললেন কাদরি। 'আমাদেরকে বেরিয়ে পড়তে হবে। সম্ভব হলে...এখনই।'

'কিন্তু কেন?'

মেয়ের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করছেন কাদরি। তারপর

শাইখের সামনে এসে দাঁড়ালেন। সংক্ষেপে সবই বললেন তিনি, ফিসফিস করে।

'সর্বনাশ! আপনি গর্দভ না কী?'

চেহারায় অপরাধী ভাব, হাত কচলাচ্ছেন কাদরি, প্রায় কান্না-করুণ সুরে বললেন, 'আর কী করার ছিল আমার, বলুন?'

'আর কী করার ছিল মানে?' গর্জে উঠল শাইখ। 'আপনার উচিত ছিল ঝামেলা মিটিয়ে আসা—তাকে মেরে ফেলা!'

চূড়া পেরিয়ে প্রায় ছয়শো ফুট নেমে এসেছে ওরা, এই সময় পুরানো অ্যালুমিনিয়াম রঙের আকাশ কালো হতে শুরু করল। গোধূলি নামছে এবং ঝড়ও আসছে।

প্রথমে প্রবল হলো তুষারপাত, দৃষ্টিসীমা কমে এল কয়েক ফুটে। তারপর শুরু হলো উপরের স্তরের মেঘে মেঘে সংঘর্ষ। প্রতিটি বজ্রপাতে ওদের সবার দাঁত পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে।

শায়লা খুব গম্ভীর হয়ে আছে। আব্বু যে সৎমা পামেলাকে হোটেল কামরায় বেঁধে রেখে এসেছে, এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে সে। তারপর শাইখ আর বোকাচিকে বিষয়টা নিয়ে আলাপ করতেও শুনেছে।

'ইজরায়েলি বা লেবাননী স্পাই, যারাই আসুক, লা-খিরাজের ওদিক থেকে আসবে বলে মনে করি না,' এটা শাইখের ধারণা।

'না, তবে মোসাদ এজেন্ট পাঠাবে সীমান্ত পথে,' একমত হলো বোকাচি। 'ওদিকে ছাড়া ছাড়া ভাবে কিছু ইহুদি পল্লী আছে।'

সন্ধ্যার আরও অনেক পর থামল ওরা। অন্ধকার, তুমুল বাতাস আর তুষারপাতের মধ্যেও শাইখের ইন্সটিঙ্কট নির্ভুল সার্ভিস দিচ্ছে। 'এটা দজ্জাল গিরিখাদ,' এক সময় ঘোষণার সুরে জানাল সে। 'এখান থেকে সীমান্ত সোজা পথে গেলে পনেরো কিলোমিটারের কিছু বেশি দূরে। এখানে আমরা বিশ্রাম নেব ভোর

হবার ঠিক আগে পর্যন্ত।'

তুষার আড়াল তৈরি করলেও আগুন জ্বালতে সাহস পেল না ওরা। একটা বোল্ডারের পাশে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকল তিনজন পুরুষ আর একটা মেয়ে। মাথার উপর একটা ঝুল পাথর ছাদ বা ছাতার কাজ করছে।

'আমার খিদে নেই,' বলল শায়লা।

'খিদে না থাকলেও জোর করে খেতে হবে,' ভারী গলায় বলল শাইখ, মেয়েটার দস্তানা পরা হাতে শুকনো মাংস গুঁজে দিল। 'শরীর গরম রাখার আর কোন উপায় নেই।'

কোন রকম আলোচনা ছাড়াই পালা করে ঘুমিয়ে নিল শাইখ আর বোকাচি—প্রত্যেকে চার ঘণ্টা করে।

ভোর হতে যখন ঘণ্টাখানেক বাকি, শাইখের মনে হলো ঝড় থেমে যাচ্ছে। সবাইকে ঘুম থেকে জাগাল সে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার রওনা হলো ওরা।

কিছু জিজ্ঞেস না করেই সামনে থাকল বোকাচি, সবার কাছ থেকে প্রায় একশো ফুট এগিয়ে।

আধ ঘণ্টা পর তুষারপাত পুরোপুরি থেমে গেল। ম্লান চাঁদ দেখা দিল আকাশে।

ভাগ্যকে অভিশাপ দিল শাইখ। সবেমাত্র শেষ গিরিখাদ বেয়ে নীচে নামতে শুরু করেছে দলটা। এরপর খোলা প্রান্তর। ওখানে পৌঁছে তারা স্কি ব্যবহার করতে পারবে, সেই সঙ্গে সম্ভাব্য অনুসরণকারীদের আরও পিছনে ফেলা সম্ভব হবে।

আবহাওয়ার ভাল হয়ে যাওয়াটা স্রেফ দুর্ভাগ্য বয়ে আনবে। কতটা, তা শাইখ টের পেল গিরিখাদের অর্ধেকটা পেরিয়ে আসবার পর।

মোট চারজন স্নাইপার, খাদের দু'দিকে দু'জন করে। চারজনই অনেক উপরে পজিশন নিয়েছে, নীচের ট্রেইল দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার।

তারা ওদেরকে সাবধান করল না, এমন কী চিৎকার করে থামবার নির্দেশও দিল না।

শক্তিশালী অটোমেটিক রাইফেলের চারটে বুলেট আঘাত করল বোকাচিকে। পরপর চারবার ঝাঁকি খেল শরীরটা, সবার চোখের সামনে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল ও। বুলেটের পরবর্তী ঝাঁকটা লাগল লাশ যখন বরফে পড়ছে।

শায়লার হাতটা খপ্ করে ধরে একটা বোল্ডার লক্ষ্য করে ডাইভ দিল শাইখ। একই সঙ্গে কাদরিকে ঠেলে দিল আরেকটা বোল্ডারের দিকে। বুলেটের তৃতীয় ঝাঁকটা মাত্র পাঁচ গজ দূরে তুষারে গর্ত তৈরি করছে।

'শুয়ে পড়ো, এই মেয়ে! নোড়ো না! কাদরি?'

'বলুন।'

'আড়াল থেকে বেরুবেন না।'

এক বোল্ডার থেকে আরেক বোল্ডারের দিকে ছুটল শাইখ, সেখান থেকে আরেকটার আড়ালে। প্রতিবার ভিন্ন অবস্থান থেকে গুলি করা হলো তাকে। শায়লার কাছে আবার ফিরে এল সে, ইতিমধ্যে যা জানবার ছিল জেনে নিয়েছে।

এটা কিলিং স্কোয়াড। লোকগুলোকে যারাই পাঠিয়ে থাকুক, তাদের উপর নির্দেশ আছে কাউকে জীবিত ফিরিয়ে আনবার দরকার নেই।

গলা চড়িয়ে নিজের ধারণার কথা কাদরিকে জানাল শাইখ।

সামি কাদরির অবিশ্বাস্য প্রতিক্রিয়া হলো। আরবী ভাষায় বিলাপ শুরু করলেন তিনি। 'আমার মেয়ে! আমার শায়লা! ও তো কোন অপরাধ করেনি, তা হলে ওকে কেন মারবে ওরা? এই, শোনো তোমরা...'

শাইখ হুংকার ছাড়ল: 'কী করছেন? না, আরে না! আড়াল থেকে বেরুবেন না!'

'খবরদার বলছি!' পাহাড় প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে চিৎকার

করছেন কাদরি, সেই সঙ্গে বেরিয়ে আসছেন বোল্ডারের আড়াল থেকে। 'আমার মেয়ের কোন ক্ষতি হলে...'

'ইস্, স্রেফ আত্মহত্যা করছে লোকটা!' শাইখের গলা থেকে হাহাকার বেরিয়ে এল।

অটোমেটিক রাইফেল থেকে ছুটে এল এক ঝাঁক তপ্ত সীসা। বোল্ডারের আরও সামনে ছিটকে পড়লেন কাদরি, শরীরটা গড়িয়ে পার হলো দুই বোল্ডারের মাঝখানের ফাঁকটুকু।

'গাধা! গাধা!' ক্রল করে কিছুটা এগিয়ে কাদরির কবজি ধরল শাইখ। পালস আছে এখনও।

চারপাশে বুলেট বৃষ্টি হচ্ছে, গ্রাহ্য না করে কাদরিকে টেনে নিজের বোল্ডারের আড়ালে নিয়ে এল শাইখ।

'আব্বু!...' ডুকরে কেঁদে উঠে বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল শায়লা।

'তুমি শান্ত হও, মেয়ে!' প্রায় ধমকে উঠল শাইখ, হাতের ঝাপটায় সরিয়ে দিল মেয়েটাকে। 'ভাল করে দেখতে দাও আমাকে।'

টান দিয়ে কাদরির পারকা খুলে ফেলল সে। আগেই লক্ষ করেছে, একটা বুলেট ঊরু ভেদ করে গেছে। বেরিয়ে এসে থামতে পারছে না, ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে যাচ্ছে রক্ত।

শায়লা ফোঁপাচ্ছে।

'এই মেয়ে!'

কাদরির শরীরের আরও দু'জায়গায় গুলি লেগেছে। একটা বাম কাঁধের একটু নীচে, আরেকটা বুকের ঠিক মাঝখানে।

কাদরির চোখের পাতা কিছুক্ষণ শুধু কাঁপল, তারপর ফাঁক হলো। সাপের মত ফোঁস-ফোঁস শব্দে নিঃশ্বাস ফেলছেন। 'শাইখ...'

'বলুন।'

'কতটা খারাপ?'

'খারাপ।'

'আল্লাহর কসম, আমাকে সত্যি কথা বলুন, ভাই—আমি মারা যাচ্ছি, না?'

শাইখ মাথা ঝাঁকাল।

'না! না-আ-আ-আ, আব্বু!' বাবার মুখটা দু'হাতে প্রায় খামচে ধরে চেঁচাচ্ছে শায়লা। 'তুমি মরবে না! আমি তোমাকে মরতে দেব না...'

'মা আমার,' বিড় বিড় করলেন কাদরি, শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে মেয়ের মাথাটা টেনে নিলেন নিজের বুকে। 'শাইখ?'

'বলুন, আমি শুনছি।'

'আপনি ওকে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন?'

উত্তর দিতে মাত্র এক সেকেন্ড ইতস্তত করল শাইখ। 'একা? ...হ্যাঁ, পারব।'

'গুড। আমার শার্টের পকেটে...একটা কাগজ...'

পকেট হাতড়ে কাগজটা বের করে আনল শাইখ। 'পেয়েছি। সংখ্যা, অক্ষর, তারপর আরও সংখ্যা।'

'এগুলো সাইফারের চাবি, শাইখ...' কাদরির কণ্ঠস্বর একেবারে নিস্তেজ হয়ে আসায় তার ঠোঁটের কাছে কান পাততে হলো শাইখকে।

কাদরি তাকে মাইক্রোফিল্ম আর উল্কির কথা বললেন। বললেন, শাফুরা এই সাইফারের বিনিময়ে এক কোটি মার্কিন ডলার দেবে; ওই সাইফারই তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে মাইক্রোফিল্মের কাছে।

'আমার মেয়েকে আপনি এই বিপদ থেকে বের করে নিয়ে যান, শাইখ। অর্ধেক টাকা আপনার। আমি শুধু চাই, শাফুরাকে দেখতে বলবেন বাকি অর্ধেক যেন আমার মেয়ে পায়, আর সে যেন ওর নিরাপত্তার দায়িত্বটা নেয়...'

'এক কোটি? ... মার্কিন ডলার?' শাইখ যেন হাঁপিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ। প্লিজ, শাইখ, আমার এই উপকারটা করুন। শাফুরা অত্যন্ত সৎ মানুষ। আপনিও নিশ্চয়ই তাই। আপনারা...'

'আব্বু...'

'শান্ত হও, মা, তোমার আব্বু মারা গেছেন।'

অকস্মাৎ পাথর হয়ে গেল শায়লা। শরীর আড়ষ্ট, চোখ নিষ্পলক, দৃষ্টি বাবার বীভৎস ক্ষতের উপর স্থির।

পাথরের আড়ালে একটা পজিশন বেছে নিয়ে পাহাড়-প্রাচীরের দিকে কয়েক রাউন্ড গুলি করল শাইখ, হামলাকারীরা যাতে কাছে আসতে সাহস না পায়।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে সে দেখল, মেয়েটা একচুলও নড়েনি।

'শায়লা?'

কোন সাড়া নেই। শায়লা নড়ল না বা চোখের পাতাও ফেলল না। প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পাওয়ায় তার চোখ স্থির হয়ে গেছে, ঝুলে পড়েছে চোয়াল দুটো।

তাকে ধরে ঝাঁকাল শাইখ। ছেড়ে দিতে আবার সেই একই অবস্থা।

এটা একটা মানসিক অবস্থা–ক্যাটাটনিয়া। রোগের নামটা শাইখের জানা নেই, তবে এরকম রোগী আগেও সে দেখেছে।

রাত নামুক, মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে শাইখ। তার আত্মবিশ্বাস আছে, পারবে সে। দুনিয়ায় এমন মানুষ এখনও জন্মায়নি যে রাতের বেলা এই পার্বত্য এলাকায় তাকে খুঁজে বের করবে।

এক কোটি মার্কিন ডলার! ভাবল সে। আহ্, জীবনে আর লাগে কী!

চারদিকে আবর্জনার স্তূপ, তার ভিতর দিয়ে মেয়েটাকে টেনে

নিয়ে যাচ্ছে শাইখ। গত আধ ঘন্টায় দু'বার তার হাত ছেড়ে দিয়েছিল সে, ভেবেছিল ইতিমধ্যে নিজের উপর খানিকটা হলেও নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে মেয়েটা, অন্তত তাকে অনুসরণ করতে পারবে। তবে না, করেনি। নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থেকেছে, তারপর সারা শরীরে শুরু হয়েছে প্রচণ্ড খিঁচুনি।

ভোর হওয়ার ঠিক আগে সীমান্ত পেরিয়ে এল ওরা। লেবাননে ঢুকে প্রথম যে গ্রামটা পেল সেখান থেকে গ্রিসে, সোহানার দেওয়া নম্বরে রিং করল শাইখ। 'খবর খুব খারাপ, ম্যাডাম।'

'কেন, কী হয়েছে?'

সংক্ষেপে সব ব্যাখ্যা করল শাইখ। শুনে আঁতকে উঠল সোহানা। কিন্তু শাইখ ওকে সামি কাদরির জন্য শোক প্রকাশ করবার সময়টুকু দিতেও রাজি না। জানাল: 'পার্টি এখন আমি আর আপনি, কাজ-কারবার সব আমার সঙ্গে করতে হবে।'

'কী বলতে চাও তুমি?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'সাইফারের কীগুলো আমি মুখস্থ করে নিয়েছি, তারপর ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি কাগজটা। আপানি যে জিনিস চাইছেন তার অর্ধেক এখন আমার কাছে, বাকি অর্ধেক রয়েছে মেয়েটার কাছে।'

'হ্যাঁ, তো কী হলো?'

'আপনার স্নায়ু, ম্যাডাম, ইস্পাত দিয়ে: আর হৃৎপিণ্ডটা শক্ত বরফ দিয়ে তৈরি। এ-ধরনের চরিত্রকেই বোধহয় কুল কাস্টমার বলে।'

'তুমি কী?'

'আমিও তাই, কিন্তু আমার তা হবারই কথা। কারণ আমি একজন চোর।'

'আমাদের কাজ মাঝে-মধ্যে তোমাদের চেয়েও বেশি নোংরা, আবদাল শাইখ। শোনো, অ্যাথেন্সে এসো না। মেয়েটাকে নিয়ে সেরেসে চলে যাও, ওখানে আমি দেখা করব।'

সোহানাকে একটা সেফ হাউসের ঠিকানা দিয়ে যোগাযোগ কেটে দিল শাইখ। এরপর সে তার দ্বিতীয় স্ত্রী ফাতেমাকে ফোন করল। কী ঘটেছে সবটুকু বলল না, নির্দেশ দিল ওদের ভাড়া করা একটা খালি অ্যাপার্টমেন্টে তার সঙ্গে যেন দেখা করে।

বিশ মিনিট পর একটা মোটরসাইকেল চুরি করল শাইখ। শায়লাকে ব্যাকসিটে বসিয়ে আশি মাইল স্পিডে ছুটল সে। বৈরুতের উপকণ্ঠে একটা প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে পৌঁছাতে তার সময় লাগল দেড় ঘণ্টা। ওখানে ওদের জন্য একটা ফোর সিটার সেসনা অপেক্ষা করছিল। এই প্লেনটা শাইখ তার স্মাগলিঙের কাজে ব্যবহার করে। ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়ে সাড়ে চার ঘণ্টার মধ্যে গ্রিসে পৌঁছে গেল তারা।

এই মুহূর্তে স্বপ্নের পথ নামে চৌরাস্তার পিছনে রয়েছে শাইখ, অ্যাপার্টমেন্ট ভবন থেকে মাত্র দুই দালান দূরে। 'আমরা ফায়ার ইস্কেপ ধরে ফ্ল্যাটে উঠব, বুঝলে?' ফিসফিস করে মেয়েটাকে বলল সে। 'সাবধান, কোন রকম শব্দ করা চলবে না।' কী বলতে চাইছে বোঝাবার জন্য নিজের ঠোঁটের উপর একটা আঙুল চেপে ধরল সে।

তবে এভাবে সাবধান না করলেও চলে। গত কয়েক ঘণ্টা ধরে শায়লা আসলে কোন শব্দই করেনি, এমনকী একটু ফোঁপায়নি পর্যন্ত।

ফায়ার ইস্কেপের তলার দিকটা প্রায় নিঃশব্দেই খুলে ফেলল শাইখ। সে আগে উঠছে, পিছু নিয়ে ভাবলেশহীন শায়লা।

পাঁচতলায় উঠে এল ওরা। গার্ডরেইল টপকে একটা কংক্রিটের কারনিসে পা দিল, সেখান থেকে চলে এল নির্দিষ্ট একটা জানালার সামনে।

একটু ছোঁয়া লাগতেই জানালা খুলে গেল দেখে স্বস্তিবোধ করল শাইখ ছদ্মবেশী পুলিশ আর তাদের ইনফরমারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ফাতেমা আগেই পৌঁছে গেছে সেফ হাউসে।

জানালা গলে ফ্ল্যাটে ঢুকতে শায়লাকে সাহায্য করল শাইখ। কমোডের সিটে পা রাখল শায়লা। 'সরে দাঁড়াও, নামতে দাও আমাকে,' বলল শাইখ।

সরে দাঁড়াল শায়লা, একটা রোবটের মত।

বাথরুমের দরজা সামান্য ফাঁক করা। সেটা দিয়ে কাছাকাছি বেডরুমটা অন্ধকার দেখল শাইখ। লম্বা হলটাও অন্ধকার, তবে লিভিং রুম থেকে খানিকটা আলো বেরুচ্ছে।

স্ত্রীর উপর বিরক্ত হলো শাইখ। জানালা খুলে দিয়ে আবার চলে গেছে ফাতেমা? নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু মেয়েটার সেবা-যত্ন করবার জন্য তাকে তো এখন দরকার।

রশি ছেড়ে দিয়ে শায়লার একটা হাত ধরল শাইখ, হলে বেরিয়ে এসে হাঁটছে। 'ফাতেমা...এই ফাতেমা, আছ না কি?'

সামনে লিভিং রুমের দরজা। আর মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। হঠাৎ তার স্ত্রীর চিৎকার নিস্তব্ধতাকে ভেঙে চুরমার করে দিল।

'ভাগো, শাইখ! কেটে পড়ো! ফ্ল্যাট ওরা চিনে ফেলেছে। এটা একটা ফাঁদ...'

পরমুহূর্তে হুলস্থুল বেধে গেল। হল আর লিভিং রুমে অকস্মাৎ আলো জ্বলে ওঠায় শাইখের চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

বেডরুম থেকে তার পিছনে বেরিয়ে এল দু'জন লোক, দু'জনের হাতেই পিস্তল। আরও তিনজনকে দেখা গেল লিভিং রুমে, একজন ফাতেমাকে ধরে রেখেছে। তারাও সশস্ত্র।

শায়লাকে ছেড়ে দিয়ে সদর দরজার দিকে ছুটল শাইখ। নাগালে পেয়ে টান দিয়ে কবাট খুলেছে, বাইরে থেকে লাফ দিয়ে ভিতরে ঢুকল আরও দু'জন—এরা ইউনিফর্ম পরে আছে।

চার-পাঁচজন পুলিশ একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল শাইখের উপর। এলোপাথাড়ি কিল-ঘুসি মারছে তারা, কেউ কেউ লাঠিপেটাও করছে।

শাইখ শুনতে পেল ফাতেমা তার নাম ধরে বিলাপ করছে।

তারপর শায়লার তীক্ষ্ণ চিৎকার ঢুকল তার কানে।

আশ্চর্য, ভাবল শাইখ। পাহাড় থেকে নামবার পর এই প্রথম কোন শব্দ করছে মেয়েটা।

এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে একা হওয়া সত্ত্বেও, নিজেকে ছাড়াবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল শাইখ। কিন্তু ধস্তাধস্তি করাই সার, কোন লাভ হলো না। তার হাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দেয়া হলো।

সবাই যখন শাইখের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে ব্যস্ত, তখন সবার অজান্তে খোলা দরজা দিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেছে শায়লা।

তিন

সাড়ে তিন বছর পর।

ঢাকা, বিসিআই হেডকোয়ার্টার।

মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খানের চেম্বার।

রিভলভিং চেয়ারে একটু বাঁকা হয়ে বসে যত্নের সঙ্গে পাইপে সুগন্ধি তামাক ভরছেন বিসিআই চিফ। জরুরি তলব পেয়ে এই মাত্র ভিজে বিড়ালের মত তাঁর সামনে এসে বসেছে মাসুদ রানা।

'অপারেশন গুডবাই সম্পর্কে কিছু জানো নাকি?' প্রিয় এজেন্টকে জিজ্ঞেস করলেন রাহাত খান, চট করে একবার দেখে নিলেন ওর কী প্রতিক্রিয়া হয়।

'অপারেশন গুডবাই…' স্মরণ করবার চেষ্টা করছে রানা।

'মানে, জানতে চাইছি, সোহানা তার এই অ্যাসাইনমেন্ট

সম্পর্কে তোমাকে কখনও কিছু বলেছিল?'

'জী,' মনে পড়ল রানার। 'বলেছিল। তিন-চার বছর আগের কথা। মিশনটা সফল হয়নি। আমার এক জার্নালিস্ট বন্ধু, সামি কাদরি, মারা যান। আমাদের একজন গ্রিক ইনফরমার, আবদাল শাইখ, আজও জেলে পচছে। ব্যাপারটা সম্ভবত ইজরায়েলি একটা ফাইল নিয়ে।'

'হ্যাঁ। অপারেশন গুডবাই ব্যর্থ হলেও, সাড়ে তিন বছর পর আবার নতুন করে কাজ শুরু করার একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে।' রানার দিকে একটা ফাইল ঠেলে দিলেন বস্। 'এটায় একবার চোখ বুলিয়ে নাও, তা হলে বর্তমান পরিস্থিতিটা সহজেই বুঝতে পারবে।'

গ্রিক ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে বিসিআই-এর সম্পর্ক খুব ভাল, সেটার সুযোগ নিয়ে আবদাল শাইখকে জেল হাজত থেকে অ্যাথেন্সের একটা সরকারী হাসপাতালের প্রিজন ওয়ার্ড-এ বদলি করবার ব্যবস্থা করল সোহানা।

'মেয়েটাকে খুঁজে বের করুন, ম্যাডাম,' হাসপাতালে দেখা করতে গেলে ওকে অনুরোধ করল শাইখ। 'তারপর জেল থেকে বের করুন আমাকে।'

'তারপর?'

'তারপর আপনার সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসব আমি।'

রানা এজেন্সির লোকবল কাজে লাগিয়ে শুধু অ্যাথেন্স নয়, সবগুলো দ্বীপ তন্নতন্ন করে খুঁজল সোহানা, কিন্তু শায়লাকে কোথাও পাওয়া গেল না। মোসাদ এজেন্টরা তাকে ইজরায়েলে নিয়ে যেতে পারে ভেবে সেখানেও খবর নিল। বৃথাই। মেয়েটা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

আবার শাইখের সঙ্গে দেখা করল সোহানা। 'কোথাও সে নেই, শাইখ। কেউ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না।'

'আমি অবাক হচ্ছি না। অ্যাথেন্স বা গোটা গ্রিসে কত মেয়ে রোজ হারিয়ে যাচ্ছে, হিসেবটা জানেন আপনি? শেষ পর্যন্ত কোথায় এদের ঠাঁই হয়, কল্পনা করতে পারেন?'

'এখন তা হলে কী হবে?' জানতে চাইল সোহানা।

'আপনি কি আমাকে জেল থেকে বের করবেন?'

'আমার হাত-পা বাঁধা, শাইখ। ইন্টারেস্টেড পার্টি জিনিসটা পাবার ব্যাপারে প্রথমে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে চায়।'

'কিন্তু মেয়েটাকে পাওয়া না গেলে পুরোপুরি নিশ্চিত হবার উপায় নেই...'

'নেই। মেয়েটাকে আমরা পেয়েও যেতে পারি, সেক্ষেত্রে তুমি কি সাইফারের কীগুলো দেবে আমাকে?'

'ম্যাডাম, একেই কি মামার বাড়ির আবদার বলে?'

আরও এক মাস খোঁজাখুঁজি চলল, কিন্তু রানা এজেন্সির এজেন্টরা শায়লাকে পেল না। ইতিমধ্যে একাধিক হত্যাকাণ্ডের অপরাধে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হলো আবদাল শাইখকে। জীবনের বাকি সময়টা কোরিডালোস জেলখানায় খেটে মরতে হবে তাকে। অ্যাথেন্স আর পাইরিয়াস-এর মাঝখানে জায়গাটা।

শেষবার তার সঙ্গে দেখা করতে এল সোহানা।

'তুমি কি সিদ্ধান্ত বদলাতে চাও, শাইখ?'

'কেন সিদ্ধান্ত বদলাব, ম্যাডাম? আমি যদি জেলের ভেতর পচে মরি, পঞ্চাশ লাখ ডলার আমার কী কাজে লাগবে, বলুন?'

সোহানা ভুরু কোঁচকাল।

'ও, কথাটা আপনাকে বলা হয়নি,' আবার বলল শাইখ। 'সাইফারের বিনিময়ে আপনি যে এক কোটি ডলার দেবেন বলেছিলেন, মিস্টার কাদরি মারা যাবার সময় সে-কথা আমাকে বলে গেছেন। বলেছেন শায়লা আর আমি টাকাটা সমান ভাগে ভাগ করে নেব।'

'হুঁ।'

'কিন্তু, ম্যাডাম, সাইফার আর চাবি ছাড়া আমরা দু'জনেই অসহায় হয়ে পড়েছি।'

'ফাতেমার কী হবে?'

'সে তো পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার পেয়েইছে, মনে নেই? ফাতেমা গ্রিক মেয়ে, বুদ্ধিও আছে, টাকাগুলো অপব্যয়ও করবে না। তা ছাড়া, বারিক তাকে সাহায্য করবে।'

এখানেই মিশনটার ইতি ঘটে।

ফাইলটা পড়া শেষ করল রানা।

'শাইখ এখন বেরুতে চাইছে,' বললেন বস্। 'লোক মারফত রানা এজেন্সির অ্যাথেন্স শাখায় মেসেজ পাঠিয়েছে সে।'

'মেসেজটা নিশ্চয়ই সোহানার নামে, সার?'

'হ্যাঁ,' বললেন রাহাত খান। 'কিন্তু ওকে তো আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে বসনিয়ায় পাঠিয়েছি। কবে ফিরবে কিছুই বলা যাচ্ছে না। সেজন্যেই তোমাকে ডেকেছি।'

'কী বলতে চাইছে শাইখ, এতদিন পরে?'

'বলছে, মেয়েটাকে পেয়েছে সে। মানে, জানে মেয়েটা কোথায় আছে। তা যদি সত্যি হয়, তাকে আমরা বের করে আনতে পারি।'

'তা কীভাবে সম্ভব, সার?' কথাটা শুনে সত্যি অবাক হয়েছে রানা। 'শাইখের যাবজ্জীবন হয়েছে!'

'সম্ভব এই জন্যে যে আমাদের আদালতে ওদের কয়েকজন হেরোইন পাচারকারীরও যাবজ্জীবন জেল খাটছে। তাদের একজন আবার ওদের এক মন্ত্রীর শালা না কী যেন হয়।'

'আমরা তাকে ছেড়ে দেব, সার?'

'না, ছাড়ব না, গ্রিক পুলিশের হাতে তুলে দেব।'

'বিনিময়ে শাইখকে আমাদের হাতে ছেড়ে দেবে গ্রিক

পুলিশ?'

'দিতেই পারে, বিনিময়ে একজনকে পাচ্ছে যখন।'

বসের সঙ্গে একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর নড়েচড়ে বসল ও, জানে বস্ এখন ওকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাবেন।

সর্বশেষ পরিস্থিতি হলো, সংক্ষেপে:

ফাতেমা, আবদাল শাইখের স্ত্রী, দু'বছর আগে মারা গেছে। স্বাভাবিক মৃত্যু, ক্যান্সারে। তবে সোহানার কাছ থেকে পাওয়া টাকাটা সে অপব্যয় করেনি। অ্যাথেন্সে ডান্স ফ্লোর সহ একটা রেস্টুরেন্ট কিনেছিল, বোন পো হামদুন বারিককে সঙ্গে নিয়ে অল্পদিনের মধ্যে ব্যবসাটা জমিয়েও তুলেছিল। কিন্তু কপালে সইল না।

যতদিন বেঁচেছিল ফাতেমা, কোরিডালোসে গিয়ে নিয়মিত শাইখের সঙ্গে দেখা করত–টাকা, সিগারেট আর মদ দিয়ে আসত। সে মারা যাওয়ার পর বারিকও নিয়মিত জেলখানায় গিয়ে খালুর সঙ্গে দেখা করে।

কিন্তু বারিক একা ব্যবসাটা ঠিকমত চালাতে পারছিল না। তাই বাধ্য হয়ে একজনকে পার্টনার নেয় সে। কী দুর্ভাগ্য, বারিক মাইকোনোস-এ রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে গত মাসের দশ তারিখে।

বারিক মারা যাওয়ার পর ব্যবসাটা চলে গেছে তার পার্টনারের হাতে। বর্তমানে এই মেয়েটিকেই জেলখানার বাইরে শাইখের প্রতিনিধি বলে মনে হচ্ছে। নিয়মিত সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে ওকে মদ, সিগারেট আর হাত-খরচের টাকা। শাইখ যে বের হতে চায়, এই মেয়েটার কাছ থেকেই তা জানতে পেরেছে রানা এজেন্সির অ্যাথেন্স শাখা।

মেয়েটার নাম লিয়া বারকা। মা লেবানিজ, বাপ গ্রিক। উত্তর গ্রিসের মেলিটি গ্রামে উনিশশো ছিয়াত্তর সালে জন্ম তার।

লেখাপড়া শিখেছে রোমে, নাচ শিখেছে প্যারিসে। অ্যাথেন্সে এসেছিল একটা নৃত্য প্রদর্শনীতে, কীভাবে যেন বারিকের সঙ্গে পরিচয় হয়। বারিক তাকে তার রেস্টুরেন্টের ডান্স ফ্লোরে নাচবার আমন্ত্রণ জানালে লিয়া সেটা প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি।

রানার দিকে লিয়ার ফাইল আর খামে ভরা একটা ফটোগ্রাফ ঠেলে দিলেন রাহাত খান। 'ছবিটা এক হোটেলের সুইমিং পুলের পাশ থেকে তোলা।'

ফাইল অনুসারে লিয়ার বর্তমান বয়স আটাশ। কিন্তু কেন যেন সেটা বিশ্বাস হলো না রানার–আরও বেশি হবে। তবে এখনও তার দেহসৌষ্ঠব যে-কোন পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবে।

'মেয়েটার অতীত বেশিরভাগটাই ঝাপসা,' ফাইল থেকে মুখ তুলে বলল রানা। 'বলা হচ্ছে বটে নৃত্য প্রদর্শনী উপলক্ষে অ্যাথেন্সে এসেছিল, কিন্তু তার এই বক্তব্যের সমর্থনে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, সার।'

'হ্যাঁ, মেয়েটার অতীত একটু সন্দেহজনকই।'

'ফাইলে তার স্বামী বা প্রেমিকের নাম নেই।'

'না।'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এ যদি একমাত্র কনট্যাক্ট হয়, এর সঙ্গেই কাজ করতে হবে আমাকে, সার।'

'হ্যাঁ, লিয়াই একমাত্র কনট্যাক্ট, রানা। সোহানাকে পাওয়া যাবে না, এ-কথা জানিয়ে বলা হয়েছে তুমি যাচ্ছ। সে তোমার অপেক্ষায় থাকবে।'

'শাইখ?'

'লিয়া। আজ থেকে তিন দিন পর। অ্যাথেন্সের দক্ষিণে, অস্টির নামে একটা বিচ রিসর্টে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। জায়গাটা চেনে ও। অত্যন্ত পশ্ রিসর্ট, ধনী লোকরাই শুধু আসা-যাওয়া করে।

'কাছাকাছি কোন হোটেলে উঠে ট্যুরিস্টের মত আচরণ করতে

হবে তোমাকে। লিয়া জানিয়েছে সেই তোমাকে খুঁজে নেবে।'

আসল কথাটাই জানা হয়নি রানার। 'সাড়ে তিন বছর পর কীভাবে শাইখ মেয়েটার খোঁজ পেল?' জিজ্ঞেস করল ও।

'তা সে জানায়নি। তবে লিয়ার কথা শুনে মনে হয়েছে, শায়লা কোথায় আছে শাইখ তা সত্যি জানে।'

মনে মনে দ্রুত একটা হিসাব করল রানা। মেয়েটার বয়স এখন আঠারো। কে জানে এই সাড়ে তিন বছর তার কোথায়, কেমন কেটেছে। ক্যাটাটনিয়া রোগটার কি চিকিৎসা হয়েছিল? সে কি এখন পুরোপুরি সুস্থ?

'এমন তো নয়, সার, আমাদের মনে মিথ্যে একটা আশা জাগিয়ে শাইখ আসলে জেলখানা থেকে বেরুবার প্ল্যান করেছে?'

'কিছুই অসম্ভব নয়,' বললেন রাহাত খান। 'তবে সত্যি যদি শাইখ শায়লা কাদরির সন্ধান দিতে পারে, আমরা আবার মাইক্রোফিল্মটা পাবার চেষ্টা করব। কারণটা তো অবভিয়াস, তাই না?'

'এই সাড়ে তিন বছরে আরও প্রভাবশালী হয়েছে বিশ্বাসঘাতকরা,' বলল রানা। 'তাদের কাছ থেকে এখন আরও বেশি সার্ভিস আদায় করছে ইজরায়েল। শেখ সালামাতের মত দেশপ্রেমিকদের সমস্যা আরও বেড়েছে।'

'হ্যাঁ। কাজেই এই লোকগুলোকে থামাতে হলে তাদের ফাইলের মাইক্রোফিল্মটা আমাদের দরকার। সেজন্যে আমাদের সেরা...' এ-পর্যন্ত এসেই ব্রেক কষলেন বৃদ্ধ, কুঁচকে ফেললেন কাঁচা-পাকা ভুরু জোড়া, '...মানে, মোটামুটি ভাল একজন এজেন্টকে পাঠাতে হচ্ছে। আজই রওনা হচ্ছ তুমি। কাগজপত্র সোহেলের কাছে পাবে। ঠিক আছে? এসো তাহলে, রানা। গুড লাক।'

চার

আবদাল্ শাইখের জুলফি প্রায় সাদা হয়ে গেছে। তার ধারণা, এর জন্য বয়স নয়, দুশ্চিন্তা দায়ী। তবে সান্ত্বনা এটুকুই, অচিরেই তার সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান ঘটতে চলেছে।

নিজের অজান্তেই চোখ উঠে গেল দেয়ালে, যেখানে ফটোটা সাঁটা রয়েছে। সারাদিনে অন্তত একশোবার ওই ফটোটা খুঁটিয়ে দেখা চাই তার।

'থাক, চাচা, মেয়েমানুষের কথা ভেবে এভাবে নিজেকে কষ্ট দেবেন না,' কৃত্রিম কাতর স্বরে বলল লেগানিস, শাইখের নতুন সেলমেট। 'আপনি যদি এরকম করেন, ফটোটা আমি নামিয়ে নিতে বাধ্য হব। আপনার কষ্ট আমার সহ্য হয় না।'

চোখ নামিয়ে লেগানিসের দিকে তাকাল শাইখ। মানুষ দেখতে খারাপ হয়, হতেই পারে, কিন্তু এমন কদর্য চেহারা জীবনে কোথাও কখনও দেখেনি শাইখ। চোখের জায়গায় কুৎসিত একজোড়া সরু ফাটল, নাকের জায়গায় স্রেফ ভেজা ভেজা দুটো গর্ত, বাঁকা ভুরুতে যেন মরচে ধরেছে, নীচের ঠোঁট উল্টানো আর মাঝখানে চেরা–বাইরের দিকে ঝুলে থাকে।

কিন্তু চোখ যাই বলুক, শাইখের মন বলে লেগানিস খুব সুন্দর একটা ছেলে–দেবদূতই বলা যায়। কেন?

কারণ এই সেলে আসবার সময় লেগানিস শাইখের জন্য মুক্তি পাওয়ার নতুন আশা নিয়ে এসেছে।

আবার চোখ তুলে ছবিটার দিকে তাকিয়ে হাসল শাইখ ছিঁচকে চোর লেগানিস প্রথম যেদিন এই সেলে এল সেদিনের কথা মনে আছে তার। নিজের ব্যাগটা খুলে ফটোটা দেয়ালে টেপ দিয়ে আটকে দেয় সে।

'আমার মা,' সহাস্যে বলল লেগানিস। 'চোখের সামনে এটা থাকলে ভুলে যাবার কোন ভয় নেই।'

এই ঘটনার প্রায় এক ঘণ্টা পর অলস ভঙ্গিতে ফটোটার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল শাইখ। প্রথমে ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারেনি। তারপর বাঙ্ক ছেড়ে ফটোটার সামনে এসে দাঁড়াল। কাছ থেকে দেখবার পর ক্ষীণ সন্দেহও দূর হয়ে গেছে।

তার মুখ থেকে বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে আসতে লেগানিস পিছন থেকে জানতে চাইল, 'আপনার বুঝি ভাল লাগছে?'

'সত্যি লাগছে, বড় ভাল লাগছে,' জবাব দিল শাইখ, প্রবল উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

ফটোটা এক মধ্যবিত্ত পরিবারের লিভিং রুমে তোলা হয়েছে। ফটোর মাঝখানে কর্ত্রীসুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে এক বয়স্ক মহিলাকে দেখা যাচ্ছে, তাকে ঘিরে বসে আছে ছ'জন সুন্দরী তরুণী।

'মাঝখানে আমার মা, আর ওরা সবাই তার খেদমতগার!'

'ব্রথেল? বেশ্যাবাড়ি?'

'এ-ধরনের শব্দ ব্যবহার করলে আমার মা আপনাকে অভিশাপ দেবে। মা বলে—প্রমোদ ভবন।'

'ওই মেয়েটা কে, কালো চুল, কালো চোখ, খাড়া নাক, দুধে-আলতা গায়ের রঙ?'

'ও, ওর কথা বলছেন! ও সুসিনা। তা হলে বলি শুনুন, ভারী লক্ষ্মী আর শান্ত আর নরম মেয়ে আমাদের এই সুসিনা। তার ওপর, সে বোবা।'

শাইখ প্রথমবার দেখেই চিনেছে। এই ক'বছরে ভরাট হয়েছে মেয়েটার শরীর। দিন দিন রূপ-যৌবন আরও খুলছে। এ সেই

হারিয়ে যাওয়া শায়লা। শায়লা কাদরি।

'শাইখ! আবদাল শাইখ!'

'হ্যা?' একজন কয়েদীর হাঁক শুনে বাস্তবে ফিরে এল শাইখ।

'আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।'

নিশ্চয়ই মেয়েলোকটা–লিয়া বারকা।

একজন গার্ডের পিছনে পজিশন নিল শাইখ, আরেকজন গার্ড তার পিছনে দাঁড়াল। পিছনের গার্ডের নির্দেশে করিডর ধরে ভিজিটর'স হলের দিকে মার্চ করে এগোল তারা।

হলের কাছাকাছি একটা খুপরির ভিতর ঢুকিয়ে গার্ডরা সার্চ করল শাইখকে। ভিজিটর'স এরিয়ায় একটা সিগারেট পর্যন্ত আনবার নিয়ম নেই। 'ঠিক আছে, শাইখ। পাঁচ নম্বর টেবিল।'

হলের দরজা নিঃশব্দে খুলে যেতে ভিতরে ঢুকল শাইখ।

তাকে হেঁটে আসতে দেখে একটু নড়েচড়ে বসল লিয়া বারকা। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো।

লালচে-সোনালি রঙের একটা ড্রেস পরেছে লিয়া, এত খাটো যে বোঝাই যায় রূপ-যৌবন ঢাকা নয়, বরং প্রদর্শন করাটাই উদ্দেশ্য।

শাইখ ভাবল, যে পুরুষ বছরের পর বছর নারী সঙ্গ থেকে বঞ্চিত, তার সামনে কী এই ড্রেস পরে আসা উচিত?

'বাহ্, শাইখ ভাই, তোমাকে আজ বেশ ঝরঝরে লাগছে।'

'ধন্যবাদ। তোমার কাছে সিগারেট হবে?'

গার্ডকে কয়েকটা ঘুষ দিয়ে নিজেদের জন্য একটা করে সিগারেট ধরাল লিয়া। সশব্দে বুক ভরে ধোঁয়া নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়ল সে। 'তোমার কথা মত রানা এজেন্সির অ্যাথেন্স শাখার সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম।'

'তারপর?'

'ওরা আমার সঙ্গে কাল রাতে যোগাযোগ করেছে। তুমি যে মেয়েটার কথা বলেছিলে তাকে পাওয়া যাবে না। অন্য একজনকে

পাঠাচ্ছে ওরা, নাম মাসুদ রানা। আমি তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে কাল সকালে অস্টির যাচ্ছি।'

লিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ধোঁয়া গিলছে শাইখ। ভাবল, জানতে পারলে ভাল হোত ওর মাথার ভিতর কী চলছে। 'আচ্ছা, বলো তো, তুমি এত ভাবে আমাকে সাহায্য করছ কেন?'

প্রায় অনাবৃত সুন্দর কাঁধ দুটো ঝাঁকাল লিয়া। 'এটা কোন প্রশ্ন হলো?' হাসল সে। 'তুমি এখন আমার পার্টনার। বারিক তার ব্যবসার অর্ধেকটা তোমার জন্যে রেখে গেছে। তা ছাড়া, তুমি বলেছ, সেই মেয়েটিকে পাওয়া গেলে আমাদের হাতে রাজ্যের ডলার চলে আসবে।'

'তুমি টাকা খুব পছন্দ করো, তাই না, লিয়া?'

হেসে ফেলল লিয়া। 'কী যে বলো না! টাকা পছন্দ করে না এমন কেউ দুনিয়ায় আছে? ভাল কথা, আসলে ব্যাপারটা কী নিয়ে, আমাকে একটু খুলে বললে হয় না?'

'সবই জানবে তুমি, লিয়া,' এবার শাইখও মুচকি একটু হাসল। 'তবে সময়মত।' খুবই দুঃখজনক যে, ভাবল সে, মাইকোনোস-এ মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে পারার আনন্দে অতিরিক্ত মদ খেয়ে রাস্তা থেকে গাড়ি নিয়ে নীচের খাদে খসে পড়ল বারিক। তবে ভাগ্যিস তার আগে লিয়াকে ফোন করে বলেছিল যে তার মিশন সফল হয়েছে।

বারিককে কবর দেওয়ার পরদিন এসে খবরটা জানাল লিয়া। সেদিনই প্রথম তাকে দেখল সে। আর দেখামাত্র মনে হলো, একে বিশ্বাস করা যায় না।

কিন্তু বারিক লিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। লিয়া ডান্স ফ্লোরের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ব্যবসাটা নাকি রক্ষা পায়।

যাই হোক, বারিক মারা যাওয়ার পর বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য শাইখের একজনকে দরকার ছিল। লিয়াকে বাধ্য হয়ে বিশ্বাস করতে হয়েছে তার।

'অস্টিরে মাসুদ রানা আসছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ।'

'খুব টাফ কাস্টমার, বুঝলে। ওর সঙ্গে খুব সাবধানে ডিল করবে তুমি। কী বলতে বলেছি শোনাও একবার আমাকে।'

'বলব টাকার অঙ্কটা দ্বিগুণ করতে হবে। সে রাজি হলে–তোমার ধারণা হতে বাধ্য–তাকে আমি জানাব মেয়েটি কোথায় আছে। তারপর যখন নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে এই সুসিনাই আসলে শায়লা কাদরি, তখন মোট টাকার অর্ধেক তোমার নামে একটা সুইস অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে।'

'ভেরি গুড। তারপর?'

সব মুখস্থ বলে যাচ্ছে লিয়া, একটা কথাও ভোলেনি। তারপর হঠাৎ সে জানতে চাইল, 'তুমি বলছ রানার সঙ্গে জিনিসটা আনতে যাবে। এই জিনিসটা কী, শাইখ-ভাই? আর তার সঙ্গে এই সুসিনা মেয়েটির কী সম্পর্ক?'

'সময়মত, লিয়া, সবই সময়মত–তার আগে কিছু জানতে চেষ্টা কোরো না।'

'এই মাসুদ রানা কি মেয়েটিকে সনাক্ত করতে পারবে, নিঃসন্দেহে?'

'না পারার কোন কারণ নেই। অতীতের সমস্ত খুঁটিনাটি জেনেই আসছেন তিনি।' হাসল শাইখ। 'এই যে তুমি সার্ভিস দিচ্ছ, এর বিনিময়ে আমি তোমার ভাগ্য বদলে দেব, লিয়া। ভাল কথা, রানা রাজি হওয়া মাত্র আমাকে জানাতে দেরি কোরো না।'

'ঠিক আছে।'

বে-র একেবারে মুখেই বহুতল শেরাটন ইন্টারন্যাশনাল। রানার স্যুইটটা দশতলায়।

রাত দশটায় খাতায় নাম লেখাবার পর পোর্টারকে দিয়ে ব্যাগগুলো উপরে পাঠিয়ে দিল ও। তারপর হোটেলের সবচেয়ে

বড় লাউঞ্জে ঢুকে ঘণ্টা দুয়েক মেয়েদের উপর চোখ বুলাল আর মাঝেমধ্যে হাতের গ্লাসে চুমুক দিল।

অনেক মেয়েই যেচে পড়ে আলাপ করতে এল, কিন্তু তাদের সঙ্গে লিয়া বারকার চেহারা না মেলায় সবাইকে এড়িয়ে গেল রানা। বিল মিটিয়ে দিয়ে উঠে এল নিজের স্যুইটে।

স্যুইট থেকে রানা এজেন্সির অ্যাথেন্স শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করল ও। না, ওরা কোন মেসেজ পায়নি।

মেয়েটা খেলছে, ভাবল রানা। রুম সার্ভিসকে দিয়ে ডিনার আনিয়ে খেল, তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়। তার সময় মত ঠিকই যোগাযোগ করবে মেয়েটা।

ঘুমটা দরকার ছিল। সকাল দশটায় চোখ মেলবার পর প্রাণশক্তিতে ভরপুর নওজোয়ান সিংহের মত লাগল নিজেকে। রুম সার্ভিসকে ডেকে কফি আর জুস চাইল।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হতে চলেছে। দশতলার ঝুল-বারান্দায় একটা চেয়ার নিয়ে বসেছে রানা, ওর নীচের সুইমিং পুলে জড়ো হওয়া সোনালি আর তামাটে রঙের মেয়েগুলোর উপর চোখ বুলাচ্ছে। দেখছে বটে, তবে মাথায় খেলা করছে অন্য একটা প্রসঙ্গ।

লিয়া বারকা কি নির্ভেজাল? এটাই তার আসল পরিচয়? বারিকের মৃত্যু সত্যি দুর্ঘটনা ছিল?

এই লিয়াকে কতটুকু কী বলেছে শাইখ?

শাইখ কী সত্যি শায়লা কাদরির সন্ধান পেয়েছে, না কি বিসিআই-এর ঘাড়ে চড়ে জেল থেকে বেরুনোর মতলব ফেঁদেছে?

পিপ্-পিপ্ করে উঠে ওর চিন্তায় বাধা দিল টেলিফোনটা।

'মাসুদ রানা?'

'বলছি।'

'এমন একটা দিন, সাঁতারের জন্যে সত্যি ভাল—তুমি কী বলো?'

'আমি কার সঙ্গে কথা বলছি?'

'আমার নাম লিয়া বারকা।'

'কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'হোটেলের পুলে বড় বেশি ভিড়।'

'তা হলে আমার স্যুইটে?'

'কোথায় যেন শুনেছিলাম, অচেনা কারও সঙ্গে আলোচনা করতে হলে খোলা জায়গাতে বসাই সবদিক থেকে ভাল।'

'তা হলে তুমিই বলো কোথায়।'

'হোটেলের সামনের বিচে তোমার নামে দুটো লাউঞ্জ চেয়ার বুক করা হয়েছে। প্রাইভেসির জন্যে দু'পাশের আরও দুটো চেয়ার রিজার্ভ করেছি আমি।'

'কখন?'

'একটায়?'

'ফাইন।'

লাইন কেটে গেল।

বেইদিং সুট পরেছে রানা, তার সঙ্গে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা একটা রোব, পায়ে একজোড়া স্ট্র স্যান্ডেল।

এলিভেটরের ঠিক নীচে অত্যন্ত বলিষ্ঠ গড়নের এক লোক হাতের পুস্তিকা থেকে চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল। চৌকো চোয়াল তার, মাথায় দুর্বিনীত একরাশ মরচে রঙের চুল। চোখাচোখি হতেই চট করে দৃষ্টি নামিয়ে নিল সে।

লোকটা নীল আর সোনালি রঙের একটা শার্ট পরেছে। ট্রাউজারটা ইস্ত্রি করা নয়। হাতে ওগুলো অ্যাথেন্সের গাইড বুক। রানা পাশ কাটিয়ে এল, লোকটা দ্বিতীয়বার তাকাল না। তবে পিঠে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অনুভব করছে ও। ওর অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়টা জানিয়ে রাখল: এই লোকের সঙ্গে আবার দেখা হবে তোমার।

সুইমিং পুলকে পাশ কাটিয়ে সৈকতে বেরিয়ে এল রানা।

হোটেলের একটা কাউন্টার আছে এখানে, নিজের নাম বলতে পথ দেখিয়ে লাউঞ্জ চেয়ারগুলোর কাছে নিয়ে এল একজন ওয়েট্রেস। দু'পাশের কয়েকটা চেয়ারে 'রিজার্ভ' ট্যাগ লাগানো রয়েছে। অর্ডার দিতে হলো না, একটু পর মেয়েটা ওকে বিয়ার দিয়ে গেল।

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, চেঞ্জিং রুম থেকে বেরিয়ে একটা মেয়েকে বালিতে পা ফেলতে দেখল রানা। লিয়া বারকা আসলে ছবির চেয়েও সুন্দর। যেমন চোখ জুড়ানো রূপ, তেমনই উথলানো যৌবন। আশপাশের লোকজন তো হাঁ করে তাকিয়ে থাকবেই, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

মেয়েটাও নিজের সম্পদ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, সেটা তার হেঁটে আসবার ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিটা দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল। কারও দিকে না তাকিয়ে সোজা রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে।

গায়ে জড়ানো রোবটা খুলল লিয়া। নীচে বিকিনি পরেছে। রানার পাশের চেয়ারটায় শুয়ে হেলান দিল।

'ভারী সুন্দর তুমি।'

'ধন্যবাদ।'

'লিয়া বারকা?'

'তুমি কি মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে আমি লিয়া বারকা।'

'হাই, লিয়া।'

'হ্যালো, রানা।'

'আমি তোমার মুখ থেকে আবদাল শাইখ সম্পর্কে শুনতে চাই।'

'শাইখ ভাই জানে কোথায় আছে মেয়েটা।'

'কোথায়?'

'আমাকে নির্দেশে দেয়া হয়েছে, নতুন একটা চুক্তিতে রাজি

হলেই শুধু সেটা তোমাকে জানাতে পারব।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'আরও টাকা।'

'হ্যাঁ।'

'কত?'

'আসল লোকের সঙ্গে যেটা ফাইনাল হয়েছিল, তার দ্বিগুণ। এর অর্ধেক পাবে মেয়েটা।'

সেটা কত হয়, উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল রানা, একেবারে শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল। 'আসল লোকের সঙ্গে যেটা ফাইনাল হয়েছিল তার দ্বিগুণ'...অর্থাৎ লিয়াকে শাইখ টাকার অঙ্কটা জানায়নি। বোধহয় ততটুকুই জানাচ্ছে যতটুকু না জানালে নয়।

'আমাকে ইন্টারেস্টেড এক পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।' মাইক্রোফোন উদ্ধারের কাজটা নতুন করে শুরু হতে যাচ্ছে, কাজেই খবরটা শেখ বায়েজিদ সালামাতকে জানানো দরকার, সেই সঙ্গে তাকে একটা ধারণা দেওয়া দরকার ঠিক কত টাকা লাগবে।

'শাইখ ভাই তা জানে।'

'গোটা ব্যাপারটা কী নিয়ে, তুমি তা জানো না, লিয়া–না কি জানো?'

'শাইখ ভাই আমাকে শুধু তার স্বার্থ দেখবার অনুরোধ করেছে। বলেছে, সব ঠিকঠাক মত ঘটলে আমিও বিরাট ধনী হয়ে যাব।'

'তবে সবটা তুমি জানতে আগ্রহী, তাই না?'

হাতব্যাগ থেকে বের করে চোখে সানগ্লাস পরল লিয়া। তারপর হাত দুটো মাথার পিছনে গুঁজে দিয়ে বলল, 'সবটা জানলে শাইখ ভাইয়ের হয়ে যে কাজটা করছি সেটা আমার জন্যে অনেক সহজ হয়ে যেত।'

ব্যাখ্যাটা মেনে নিল রানা, আপাতত। 'আমি জানতে চাই

শাইখ কী ভাবে খোঁজ পেল মেয়েটার। আমাদের লোকজন শুধু গ্রিসে নয়, আরও কয়েকটা দেশে মাসের পর মাস তল্লাশি চালিয়েও তাকে খুঁজে পায়নি।'

'ইদানীং শাইখ ভাইয়ের নতুন একজন সেলমেট জুটেছে।'

'কে সে? নাম কী?'

হেসে ফেলল লিয়া। 'তুমি আমার সঙ্গে কৌশল করছ। কী করে ভাবলে আমি তোমাকে সেলমেটের নাম বলে দেব?'

'ঠিক আছে, বোলো না।'

'শোনো, ওই সেলমেট দেয়ালে তার মায়ের একটা ফটো ঝুলিয়েছিল। সেই ফটোয় আরও কয়েকটা মেয়ে ছিল। ওই মহিলা একটা ব্রথেল চালায়। মেয়েটা, যাকে তোমরা সবাই এত খোঁজাখুঁজি করছ, ওই ফটোয় আছে।'

'সর্বনাশ!' বিড় বিড় করল রানা। ভদ্র পরিবারের অসহায় একটা মেয়ে নিয়তির প্রহসনে শেষ পর্যন্ত ঠাঁই পেয়েছে একটা বেশ্যাবাড়িতে? ওই বাড়ির কর্ত্রী নিশ্চয়ই তাকে ভাল থাকতে দেয়নি। ওর সিনিয়র বন্ধু কাদরির সদাহাস্যময় চেহারারটা মনে পড়ে গেল; তার মেয়ের এই নিয়তি মেনে নিতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। 'শাইখ তাকে ঠিক-ঠিক চিনতে পেরেছে—কোন সন্দেহ নেই?'

'তার কোন সন্দেহ ছিল না, তারপরও বারিককে পাঠিয়ে নিশ্চিত হয়েছে। বারিক সম্পর্কে জানো তো?'

'জানি।'

'আগেই বলেছি, বৃদ্ধা মহিলা একটা ব্রথেল চালায়। মেয়েটা ওই বাড়ির বেশ্যাদের একজন। এখন তার নাম সুসিনা।'

'অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাবার আগে বারিক মেয়েটার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত করেছিল?'

'শাইখ ভাই তো সে-কথাই জানিয়েছে আমাকে।'

'কীভাবে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব? দুনিয়ায় প্রায় একই রকম চেহারার মানুষ হয় না, এমন তো নয়।'

ঠোঁট কামড়ে এক মুহূর্ত চিন্তা করল লিয়া, তারপর স্বীকার করল যে সে আসলে জানে না। 'তবে শাইখ ভাই বলল, ঢাকায় তোমাকে ব্রিফ করা হবে, ফলে মিস শাফুরা যা জানতেন তা তুমিও জানবে–অর্থাৎ মেয়েটার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হবার উপায়টা তোমার অজানা থাকার কথা নয়।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, 'না, তা নয়।'

'তুমি কি আজ বিকেলে ইন্টারেস্টেড পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে?'

'বোধহয়।'

ঠোঁটের কোণ বাঁকা করে মুখে দুষ্টামি ভরা হাসি ফোটাল লিয়া, রানার হাঁটুতে একটা হাত রেখে চাপ দিল একটু। 'খুশি হলাম। তোমার পার্টি যদি শাইখ ভাইয়ের দাবি মেনে নেন, আজ রাতে আমরা আনন্দ করার জন্যে একসঙ্গে ডিনার খেতে পারি। তুমি কী বলো?'

আমি তোমার রহস্য ভেদ করতে চাই, ভাবল রানা। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' রাজি হলো ও। 'কোথায়?'

'সী গাল রেস্তোরাঁয়। আটটায়, কেমন?'

'ঠিক আছে,' বলে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা। 'অন্য একটা প্রসঙ্গ।'

'হ্যাঁ, বলো।'

'আচ্ছা, বারিক কি খুব বেশি মদ খেত?'

'সারাক্ষণ। হয় ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা ভুলতে, নয়তো অ্যাডিক্টেড হয়ে পড়েছিল।'

'দুর্ঘটনার সময় তার কি কারও সঙ্গে প্রেম ছিল?'

'তা আমার জানা নেই। তার এ-ধরনের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আমি কোন রকম আগ্রহ দেখাইনি। তা হলে আটটায়, সী গালে, কেমন?'

হোটেলে ফিরবার পথে একবারও পিছন ফিরে তাকাল না

রানা। দশতলায় উঠে এসে ঝুল-বারান্দায় বেরুল, চোখে বিনকিউলার তুলে তাকাতে দেখল এখনও চেয়ারটায় শরীর এলিয়ে দিয়ে পড়ে রয়েছে লিয়া।

পাঁচ

সী গাল রেস্তোরাঁটা এত বড় যে এর ভিতর কেউ হারিয়ে গেলে তাকে খুঁজে বের করা বেশ কঠিন। সৈকতের কিনারায় বিশাল প্যানডেল বা চাঁদোয়া খাটিয়ে কয়েকশো টেবিল ফেলা হয়েছে, যত দূর দৃষ্টি যায় একটা টেবিলও খালি নেই।

কোমল আলোয় সৌন্দর্যের প্রতিমা সেজে এক কোণের একটা টেবিলে একা বসে আছে কেউ একজন, বসবার ভঙ্গিটা লীলায়িত, দূর থেকে চিনতে না পারলেও রানা ধরে নিল এ মেয়ে লিয়া না হয়ে যায় না।

হেঁটে এসে মুখোমুখি চেয়ারটায় বসতেই নিজের হাতটা সাধল লিয়া, সেটা ধরে আলতো করে উল্টোপিঠে একটা চুমো খেল রানা। তবে সেন্টের গন্ধটা চিনতে পারল না।

'সুটটা যে সেলাই করেছে তার পরিশ্রম সার্থক,' বলল লিয়া। 'কেউ বিশ্বাস করবে না এরচেয়ে ভাল ফিগার তার কল্পনায় ছিল।'

'তোমাকেও মারাত্মক লাগছে।' টাইট সাদা ব্লাউজ আর লাল স্কার্ট পরেছে লিয়া।

লিয়ার হাসিটা নির্ভেজাল মনে হলো। টেবিল থেকে গ্লাস তুলে ছোট্ট একটা চুমুক দিল সে। 'আশা করি কিছু মনে করছ

না–তোমার জন্যে অপেক্ষা না করেই অর্ডার দিয়ে ফেলেছি।'

'ভাল করেছ, নেটিভ বলে কথা।' ওয়েটার কাছে এসে দাঁড়াতে নিজের জন্য স্কচ চাইল রানা। সেটা না আসা পর্যন্ত চুপ করে থাকল, তারপর বলল, 'এটা আমার কাছে একটা ধাঁধার মত–তুমি বিয়ে করোনি কেন?' প্রশ্নটা করে জানিয়ে দেয়া হলো, তার সম্পর্কে একটা ফাইল আছে ওর কাছে, এবং সে মিথ্যেকথা বলে কি না পরীক্ষা করা হচ্ছে।

লিয়ার চোখের পাতা কাঁপল না, এমনকী উত্তর দিতে সে কোন সময়ও নিল না। 'খুব তাড়াতাড়ি আমি বুঝে ফেলি, একই সঙ্গে স্বাধীনচেতা নারী আর কারও স্ত্রী হওয়া অত্যন্ত কঠিন। বড় পেট আর ফোলা স্তন নিয়ে স্ত্রীরা থাকবে নেপথ্যে, একমাত্র কাজ নিয়মিত সন্তান প্রসব করা।'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কথাটা মিথ্যে নয়। তোমার মধ্যে মায়ের রূপ আমি দেখছি না।'

'আমি একটা মেয়েমানুষ, রানা, ঠিক তুমি যেমন একটা পুরুষ মানুষ।'

'এত জোর দিয়ে বলার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন তাৎপর্য আছে।'

'তোমার মধ্যে আমি এক ধরনের নিষ্ঠুর বুনো ভাব, একটা বিধ্বংসী অস্থিরতা লক্ষ করেছি–বলতে পারো মনের চোখ দিয়ে দেখতে পেয়েছি। আমার ভাল লেগেছে। সাধারণ, ভোঁতা, অনুগত লোক আমার অসহ্য লাগে।'

আলোচনা আরও ভারী হয়ে উঠবার আগে ডিনার এসে গেল: গ্রিলড্ ফিশ, ভেজিটেবল সুপ, টার্কিশ ডিলাইট।

খাওয়ার সময় কথা হলো না।

হাতে কফির কাপ নিয়ে সামনের দিকে একটু ঝুঁকল লিয়া। 'ধরে নিচ্ছি পার্টির সঙ্গে তোমার কথা হয়েছে।'

'হ্যাঁ।' চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'শাইখের কথামত এই মেয়েটা যদি সেই মেয়েটা হয়, আর তথ্যটা যদি এখনও তার

কাছে থেকে থাকে, টাকা ঢালতে রাজি আছে সে।'

বড় করে নিঃশ্বাস ছেড়ে লিয়াও হেলান দিল চেয়ারে। 'এরই মধ্যে তুমি বুঝতে পেরেছ যে শাইখ ভাই আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। ফলে আমিও তাকে সবটুকু বিশ্বাস করি না··· তাকে বা তোমাকে।'

'আর আমি তোমাদের কাউকেই বিশ্বাস করি না–পুরোপুরি।'

রানার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল লিয়া। কফি ঢালছে, রানা লক্ষ করল তার হাত কাঁপছে না। 'আমাকে তুমি লোভী বলতে পারো, রানা। এই ব্যাপারটার সঙ্গে আমাকে যদি জড়াতে হয়, দুটো জিনিস জানতে চাইব আমি।'

'যেমন?'

'প্রথমে জানতে চাই শাইখ ভাই মোট কত টাকা পাচ্ছে। আমাকে অর্ধেক দেয়ার কথা বলেছে। প্রচুর দেবে বলেছে, বলেছে ধনী হয়ে যাব। জানতে চাই, কীসের অর্ধেক, সেটা কত?'

পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে দেখছে রানা। এই পর্যায়ে শাইখ আর তার খেলাকে গুরুত্ব দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ঝুঁকি নিয়ে ফিল্ড ওঅর্ক করতে হবে লিয়া আর ওকে, শাইখ আরামে বসে থাকবে নিরাপদ কোরিডালোস কারাগারে। 'ঠিক আছে। শাইখ তোমাকে যদি অর্ধেক দেয়, তোমার ভাগে পঞ্চাশ লাখ মার্কিন ডলার পড়বে। তবে টাকাটা তুমি তার কাছ থেকে কীভাবে আদায় করবে, সেটা তোমার ব্যাপার। আমি শুধু একটা ব্যাপারে মাথা ঘামাব–কীভাবে তথ্যগুলো পাওয়া যায়।'

'আমি মেনে নিলাম। দ্বিতীয় কথা, আমি অন্ধ সেজে থাকতে রাজি নই। আমাকে জানতে হবে আমরা কীসের পিছনে ছুটছি।'

'ছুটছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মাইক্রোফিল্মের পিছনে। একটা সাইফার আছে, তার সাহায্যে জানা যাবে মাইক্রোফিল্মগুলো কোথায় পাব। আর আছে কী–এই সাইফার ভাঙার চাবি। দুটোই আমার চাই।'

'ওগুলো আছে এই মেয়ে, সুসিনার কাছে?'

'ওর কাছে সাইফার আছে, চাবি আছে শাইখের কাছে।'

লিয়ার তুলনা পাওয়া কঠিন। আপাতদৃষ্টিতে তার কোন প্রতিক্রিয়াই হলো না। নিজের উপর এতটা নিয়ন্ত্রণ খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু রানার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে উত্তেজনা বা ভাবাবেগ ধরা পড়ে গেল।

চোখের তারায় ক্ষীণ আলো জ্বলল, তৃপ্তি বোধ করায় কোমল হলো দৃষ্টি। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে ভেবে মাথায় টুকে রাখল রানা: টাকার ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া, প্রায় শূন্য; সাইফার আর কী সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার প্রতিক্রিয়া, অত্যন্ত জোরাল।

লিয়া বারকার লোভটা আসলে কীসের উপর?

'শেষ একটা কথা...শাইখ ভাইকে অবশ্য এরইমধ্যে জানিয়ে দিয়েছি। আমি কিন্তু সারাটা পথ সঙ্গে থাকব, একেবারে শেষ পর্যন্ত। তার আগে আমাকে যদি ভাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা হয়, স্রেফ খুন করে ফেলব–যদি প্রয়োজন হয় দু'জনকেই।'

লিয়ার পক্ষে তা সম্ভব। 'ফেয়ার এনাফ। এবার বলো, মেয়েটা কোথায়?'

'মাইকোনোসে।'

'আমিও তাই আন্দাজ করেছি।'

'জানো বোধহয় যে ওটা আসলে একটা জেট-সেট আইল্যান্ড–ধনী লোকজনের ফুর্তির জায়গা? ম্যাডামের নাম গ্লোরিয়া। তার ঠিকানা একটা নয়, দুটো–একটা ধনীদের জন্যে, আরেকটা বিদেশী ট্যুরিস্ট আর স্থানীয় মধ্যবিত্তদের জন্যে।'

'সুসিনা কোথায় আছে?'

'সেন্ট্রাল স্কোয়ার-এর কাছেই, টুয়েলভ হারামা স্ট্রিটে। মেয়েটাকে আমরা পাবার পরই শাইখ ভাইকে বের করে আনতে হবে। সেটা কীভাবে?'

'এরইমধ্যে গ্রিক সরকারের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছি

আমরা। এ-সব ব্যাপারে একটু সময় লাগে। তবে মেয়েটিকে আমি নিশ্চিতভাবে চিনতে পারলে কোন সমস্যা হবে না।'

'কখন তুমি চিনতে চাও?'

'কাল সকালে মাইকোনোসে যাচ্ছি আমি।'

আবার মেজাজ বদলে যাওয়ায় লিয়ার চোখে-মুখে সূক্ষ্ম পরিবর্তন লক্ষ করল রানা।

'কাল সকালে মাইকোনোসে যাচ্ছি আমরা,' শেষ শব্দটায় জোর দিল লিয়া।

'বেশ, যাচ্ছি,' সায় দিল রানা। 'তো কাজের কথা যখন শেষ হয়েছে, এসো...'

'খবরদার, বাজে কথা বলবে না!' চোখ রাঙাল লিয়া। পরমুহূর্তে নিজের রসিকতায় নিজেই খিলখিল করে হেসে উঠল।

আশপাশের লোকজন নতুন করে আর কী তাকাবে, তারা অনেক আগে থেকেই নির্লজ্জের মত লিয়ার রূপসুধা পান করছে।

'না, ঠিক আছে—এসো, সময়টা বাজে ভাবেই কাটাই,' হাসি থামিয়ে বলল লিয়া, তবে তার চোখের হাসি থামল না। 'বলো কোথায়?'

'আমার হোটেলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হোটেল আমার দু'চোখের বিষ। আমার ভিলায়?'

'আমি জানি তুমি অ্যাথেন্সেই বাস করো।'

'অ্যাথেন্সে আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে। একটা ভিলা আছে অস্টিরে।'

'সেক্ষেত্রে ভিলাতেই চলো।'

মখমলের হালকা একটা চাদর আছে লিয়ার, সেটা ক্লোকরুম থেকে সংগ্রহ করতে হলো। সৈকত থেকে অন্ধকার রাস্তায় উঠে এসে চাদরটা কাঁধে জড়িয়ে দিচ্ছে রানা, ওর গায়ের সঙ্গে সেঁটে এল লিয়া। তারপর মাথার পিছনে চাপ দিয়ে রানার মুখ নীচে নামিয়ে আনল।

রানা নয়, লিয়াই ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে বারবার চুমো খেল। তারপর সাড়া দিল রানাও।

'আমার গাড়ি ওদিকের বাঁকে, দুই ব্লক দূরে এসো।'

পাথর দিয়ে বাঁধানো সরু রাস্তাটার মাঝখান দিয়ে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে ওরা। সারাদিন তুমুল বেচাকেনার পর মালিকরা তাদের দোকান-পাট বন্ধ করে দিয়েছে তাই আলোর উৎস বলতে প্রতিটি মোড়ে বসানো একটা করে লাইটপোস্ট।

বাঁকের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় একটা দোরগোড়ার গাঢ় ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে ওদের পথ আগলে দাঁড়াল দু'জন লোক–ঠিক ছয় ফুট দূরে। রাস্তায় যা-ও বা দু'একজন লোক ছিল, খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে টের পেয়ে এদিক-ওদিক সটকে পড়ল।

আবছা আলোতেও একজনকে চিনতে পারল রানা, ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আগেই জানিয়ে রেখেছিল আবার এর সঙ্গে দেখা হবে। নীল-সোনালি শার্টটা অবশ্য গায়ে নেই, তার বদলে লাল গেঞ্জি পরেছে। অপর লোকটা দীর্ঘদেহী, ধারাল চেহারা। এ-ও নীল গেঞ্জি আর ট্রাউজার পরে আছে।

রানার পাশে অকস্মাৎ একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লিয়া। গলার ভিতর থেকে আঁতকানোর আওয়াজ বেরিয়ে এল, একটা হাত যেন নিজের অজান্তেই গলায় এসে ঠেকল। চট করে একবার চোখ বুলিয়ে রানা বুঝে নিল তার ভয় পাওয়াটা অভিনয় নয়, মুখ থেকে প্রায় সব রক্তই নেমে গেছে।

আওয়াজ পেয়ে ঝট করে ঘাড় ফেরাল রানা পিছন থেকে আরও দু'জন আসছে–একজন সরাসরি, আরেকজন রাস্তার ওপার থেকে। এরা দু'জনেই কালো জ্যাকেট পরে আছে তবে এখনও তারা বেশ খানিকটা দূরে।

'তোমার চাবি কোথায়?' ফিসফিস করল রানা

'হাতে।'

'আমি বলা মাত্র পা ছুঁড়ে জুতো খুলবে, তারপর খিঁচে দৌড়াবে।'

'কিন্তু...'

'যা বলছি করো। গাড়িতে তুমি নিরাপদ থাকবে।'

'কিন্তু তুমি?'

'সামনের রাস্তা ধরে ব্লকটাকে চক্কর দিতে শুরু করো, যতক্ষণ না দেখতে পাও আমাকে। আমার সঙ্গে কেউ থাকলে থেমো না আবার।'

লাল গেঞ্জির হাতে ছোট একটা ছুরি বেরিয়ে এল, অলস ভঙ্গিতে ধার পরীক্ষা করবার ভান করছে, আর মাঝে মধ্যে চোখ তুলে রানাকে দেখছে।

রানার দৃষ্টি কেড়ে নিল দীর্ঘদেহী লোকটা, যার গায়ে নীল গেঞ্জি। কোমর থেকে টেনে যে জিনিসটা সে বের করছে সেটা প্রায় পনেরো ইঞ্চি লম্বা, সাইলেন্সার লাগানো একটা পিস্তল। পরিষ্কার দেখতে পেল রানা, বাম হাতে ধরা পিস্তলের মাজলটা সরাসরি লিয়ার বুকের দিকে তাকে করছে আততায়ী।

'ছোটো!' লিয়াকে ছোট্ট একটা ধাক্কা দিয়ে লাফিয়ে এগোল রানা সামনে। বাঁ পায়ে শরীরের ভর চাপিয়ে ডান পা দিয়ে ফ্লাইং কিক মারল পিস্তলধারীর বাম বগল লক্ষ্য করে। উড়ন্ত লাথিটা লেগেছে, তবে ভোঁতা একটা 'ডব্' আওয়াজ শুনে রানা বুঝতে পারল পিস্তলের ট্রিগার টেনে দিয়েছে লোকটা। পাশের বাড়ির ইঁটের দেয়ালে ঘষা খেল বুলেটটা, তারপর চিঁ শব্দ তুলে ছুটে গেল আরেক দিকে। লোকটা লাথি খেয়ে দোড়গোড়া ছিটকে পড়ল, একটু আগে যেখান থেকে বেরিয়েছিল সে।

রানা থামেনি, ভারসাম্য ফিরে পেয়েই লাল গেঞ্জির ছুরি ধরা হাতে আরেকটা ফ্লাইং কিক চালাল–এবার ডানপায়ে ভর দিয়ে বাম পায়ের কিক্। ছুরিটা ছিটকে গেল একদিকে, লোকটা পিছু হটতে গিয়ে হোঁচট খেল। তাল ফিরে পেয়ে নিরস্ত্র লোকটার মুখে

পরপর কয়েকটা ঘুসি মারল রানা–আওয়াজ শুনে সন্দেহ হলো তার বোধহয় একটা চোখ গলে গেছে সে-ও ছিটকে পড়ল সঙ্গীর গায়ের উপর।

'কী করছ তোমরা, অ্যাঁ?' রানার পিছন থেকে চিৎকার ভেসে এল। 'পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে পেয়েও মেয়েলোকটাকে খতম করতে পারলে না?' লোকটা হিব্রু ভাষায় ধমকাচ্ছে। 'যাও, পিছু নিয়ে শেষ করে এসো ওটাকে, আমরা একে সামলাচ্ছি!'

লাল-নীল গেঞ্জি ব্যথায় উহ্-আহ্ করতে করতে কোন রকমে সিধে হলো, তারপর ছুটল লিয়াকে ধরবার জন্য। তারপর ছুটল লিয়াকে ধরবার জন্য। তবে রানা জানে, লিয়া ইতিমধ্যে অনেকটা দূরে সরে যেতে পেরেছে–যে-কোন মুহূর্তে তার গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ হবে।

লাল-নীল গেঞ্জি বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, ধীরেসুস্থে ঘুরে দাঁড়াল রানা। দুটোর মধ্যে কালো জ্যাকেট পরা একজন দশ গজের মধ্যে চলে এসেছে। তার হাতে আগায় স্পাইক লাগানো একটা লোহার চেইন দেখতে পাচ্ছে রানা। অপর লোকটা আরেকটু পিছনে, রাস্তা পেরুচ্ছে, তার হাতে একটা ব্যাটন–চকচকে, ছোট লাঠির মত।

এই সময় দূর থেকে একটা ইঞ্জিন স্টার্ট নেওয়ার শব্দ হলো। রাস্তার সঙ্গে চাকার গা রি-রি করা আওয়াজ। যাক, লিয়া পালাতে পেরেছে। তারপর, গেঞ্জি দুটোর কথা মনে পড়তে, ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা।

বাঁক ঘুরে ফিরে আসছে লাল নীল-গেঞ্জি। ওয়ালথারটা হোটেল স্যুইটে রেখে এসেছে, সেজন্য নিজেকে তিরস্কার করল রানা।

ব্যাটন আর লোহার চেইন নিয়ে এগিয়ে আসছে দুই কালো জ্যাকেট। ডান হাতের পেশি শক্ত করে বগলের কাছাকাছি ছুরিটার স্প্রিঙ রিলিজ করল রানা। খেয়াল করল, চেইন রয়েছে সামনের

লোকটার হাতে। পেনসিলের মত সরু ফলার ছুরিটা ওর মুঠোয় চলে এসেছে।

চেইন চালাল লোকটা। বাম হাত তুলে বাড়িটা ঠেকাল রানা, কিন্তু হাতের উপর দিয়ে ঘুরে এসে বাম কাঁধে গেঁথে গেল স্পাইক। চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে গেল ওর তীক্ষ্ণ ব্যথায়। ডান হাত তুলল লোকটার গলার দিকে। সুচের মত ধারাল ছুরির ডগা চিবুকের নীচ দিয়ে সাঁৎ করে পৌঁছে গেল মগজে।

ইতিমধ্যে লাল-নীল গেঞ্জি কাছাকাছি এসে গেছে। প্রাণহীন দেহটা শূন্যে তুলে তাদের দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। পরমুহূর্তে দ্বিতীয় কালো জ্যাকেটের দিকে এগোচ্ছিল। সঙ্গীর করুণ অবস্থা দেখে লাফিয়ে একপাশে সরে গেল সে।

'এই, ও শালা তো আব্রাহামকে মেরে ফেলেছে!' পিছন থেকে গেঞ্জিদের কেউ একজন বলল।

উত্তরে অপরজন বলল, 'তুমি ওর ব্যবস্থা করো। আমি গাড়িটা নিয়ে আসি। লাশটা তুলতে হবে।

পিছন থেকে গুলি হতে পারে, নিজেকে মনে করিয়ে দিল রানা। কপাল বরাবর ব্যাটনের আঘাত মেনে নিয়ে বিদ্যুৎ বেগে সেঁটে গেল দু'নম্বর জ্যাকেটের গায়ে। ব্যাটন চালাচ্ছে লোকটা, কিন্তু এখন আর সুবিধে হচ্ছে না। ছুরি ধরা মুঠির একটা নক আউট পাঞ্চ কষাল রানা লোকটার চিবুকের নীচে। 'আঁক' করে একটা শব্দ বের হলো ওর মুখ থেকে। পড়ন্ত অবস্থাতেই রানার শেষ লাথিটা খেল সে পেটে, রাস্তায় শুয়ে দেখল সাঁৎ করে ঢুকে পড়ল রানা একটা গলিতে।

প্রাণপণে ছুটছে রানা। তবে এক মিনিটও পার হলো না, পিছন থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এল।

'ওই, পালাচ্ছে!'

'কী করিস! করিস কী! গুলি করতে মানা করেছে না? এটাকে জ্যান্ত ধরতে হবে।'

গলিটা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেছে। বাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে আসবার পর শেষ মাথায় আরেকটা লাইটপোস্ট আর আলোর আভা দেখতে পেল রানা। অনেকক্ষণ হলো দৌড়াচ্ছে, ফলে হাঁপাচ্ছে খুব। হাঁটু দুটোয় হাড় আছে বলে মনে হচ্ছে না।

গলিটার পর চওড়া রাস্তা দেখা যাচ্ছে, ওপারে খোলামেলা বিরাট গ্রাম। এক মুহূর্ত থেমে আন্দাজ করতে চাইল, লিয়া কোন দিকে যেতে পারে। কিন্তু ছুটন্ত বুটের আওয়াজ দ্রুত কাছে চলে আসছে শুনে আবার ছুটল।

ওর বাম দিকে চড়াই, ডান দিকে উৎরাই।

নীচে দ্রুত নামা যাচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রানাকে ধরে ফেলল লোকগুলো। দু'জন ওরা, একটা গেঞ্জি আর একটা জ্যাকেট।

তাদের একজন ডাইভ দিল ওর পা লক্ষ্য করে। গোড়া কেটে নেওয়া গাছের মত পড়ল ও, দ্বিতীয় লোকটা উঠে গেল শূন্যে—সে ওর পিঠ লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছিল।

গড়িয়ে সরে যেতে পারল রানা। ওর হাতে আবার বেরিয়ে এসেছে অনুভূতিহীন বন্ধু।

শূন্য থেকে নেমে আসছে লোকটা, জ্যাকেট, ঘ্যাচ্ করে তার কলজে বরাবর সেঁধিয়ে দিল রানা ছুরিটা। রাস্তার উপর পড়ল সে, ছুরি বের করে নেওয়ার আগে হাতলটা একটু মোচড়াল ও। লোকটা ঘোড়ার মত চিঁচিঁহিঁ আওয়াজ করে উঠল।

গড়িয়ে সরে এল রানা, বুক থেকে বের করে নিয়েছে রক্তাক্ত ছুরিটা।

বুক চেপে ধরে ভ্রূণের আকৃতি নিয়েছে ইহুদি লোকটা, ইঁ-ইঁ-ইঁ করে গোঙাচ্ছে। সিধে হয়ে তার নিতম্বে ঝেড়ে একটা লাথি মারল রানা।

অপর লোকটা হাঁটু গেড়ে বসে কুস্তি লড়ছে নিজের পিস্তলের সঙ্গে। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা কোনভাবে আটকে গেছে ওর প্যান্টের হিপ পকেটে, বের করতে পারছে না। মোরব্বা কাচার

মত কাচল রানা লোকটার দুই কাঁধ তীক্ষ্ণ স্টিলেটো দিয়ে। দুই পাশে ঝুলে পড়ল ওর হাত, পিস্তল বের করবার ক্ষমতা নেই।

এই সময় শক্তিশালী একটা ইঞ্জিন গর্জে উঠল, পাথুরে রাস্তার সঙ্গে ঘষা খেল চাকা, বাঁক ঘুরে আঘাত করল চোখ ধাঁধানো হেডলাইটের আলো। রানা দেখল, ঘৃণা আর ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে লোকটার চেহারা।

লাইট পোস্টের আলোয় দেখা গেল, তীরবেগে ছুটে আসছে ওদের দিকে ধূসর রঙের ঝকঝকে একটা মার্সিডিজ।

রানা আর গাড়ি, গাড়ি আর রানা—পালা করে বার কয়েক তাকাবার পর লাফ দিয়ে সিধে হলো লোকটা, হিব্রু ভাষায় কাকে যেন খিস্তি করল, তারপর ছুটে ঢুকে পড়ল গলির মুখে—অকেজো হাতদুটো ঝুলছে শরীরের দুই পাশে।

মার্সিডিজ সরাসরি রানার দিকে ছুটে আসছে। কিন্তু ওর আর লড়াই করবার শক্তি নেই। লাফ দিয়ে একটা দালানের গায়ে সেঁটে গেল ও।

একটু পরই মাত্র কয়েক ফুট দূরে থামল মার্সিডিজ। দরজা খুলে গেল 'ভেতরে ঢোকো! জলদি!'

ড্রাইভিং সিটে লিয়া, প্রচণ্ড রাগে হিংস্র দেখাচ্ছে তাকে।

লিয়ার ভয় গেল কোথায়? ভাবল রানা।

'দূর ছাই! জলদি এসো!'

আবার পায়ের শব্দ। আরও মানুষ আসছে ছুটে। এক লাফে মার্সিডিজে ঢুকল রানা। ইতিমধ্যে আহত লোকটার পকেটে যা কিছু ছিল সব নিজের পকেটে ভরে নিয়েছে। ওকে পাশ কাটাল লিয়ার একটা হাত। দরজাটা সশব্দে বন্ধ হলো। পরমুহূর্তে ঝাঁকি খেয়ে ছুটল গাড়ি।

'কী অবস্থা তোমার?' জানতে চাইল লিয়া।

'বাঁচব। তোমার ভিলাটা কোথায়?'

'পাহাড়ে, আরও মাইল দুই যেতে হবে।'

'ঘুর পথ ধরো।'

'ওখানে কোন সমস্যা নেই।'

'কী?'

'ভিলার কথা বলছি। ওটার কথা কেউ জানে না। আমি বেনামে কিনেছি।'

লিয়া দু'চাকার উপর বাঁক ঘুরবার সময় ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল রানা। 'যতটা খুশি ঘুরে চলো, তবে স্পীড কমিয়ে। তুমি যেভাবে চালাচ্ছ, টায়ারের আওয়াজ শুনেই পিছু নিতে পারবে ওরা।'

স্পীড কমিয়ে টিস্যু দিয়ে কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছল লিয়া। 'আচ্ছা, কী কারণে ওরা আমাদেরকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছিল?'

রানা তার প্রশ্নের কোন জবাব দিল না, কারণ ওর ধারণা জবাবটা জেনেও না জানার ভান করছে লিয়া। ওদেরকে নয়, লোকগুলো খুন করতে এসেছিল শুধু লিয়াকে।

ছয়

লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা জায়গাটা। ঘন, নিশ্ছিদ্র ঝোপ-ঝাড় থাকায় বাইরে থেকে ভিতরটা প্রায় কিছুই দেখা যায় না। অন্ধকার ড্রাইভওয়েতে উঠল মার্সিডিজ, ভারী কাঠের গেটের উপর আলো পড়ল।

ড্যাশবোর্ডে কিছু একটা টিপেছে লিয়া, এরই মধ্যে দরজাটা

নিজে থেকে খুলে যাচ্ছে।

'প্রাইভেসি,' মন্তব্য করল রানা।

'সেজন্যেই এটা কেনা। প্রাইভেসি। এমন একটা জায়গা যেখানে নির্জনতা পাব, একা হতে পারব আমি।'

বৃত্তাকার ড্রাইভ ধরে ছুটল মার্সিডিজ, দু'পাশের বাগানগুলো পিছিয়ে পড়ছে দ্রুত। ফুলের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস।

'এসো, তোমাকে সাহায্য করি।' রানার বগলের নীচে নিজের একটা কাঁধ ঢুকিয়ে দিল লিয়া।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে সাদা মার্বেল পাথরের কয়েকটা ধাপ টপকাল ওরা। কাঠের প্রকাণ্ড দরজাটা বেশ শক্ত মনে হলো, ভাঙতে হলে কামান লাগবে।

ভিতরটা পুরো অন্ধকার। কয়েক পা হাঁটিয়ে এনে রানাকে ছেড়ে দিল লিয়া। 'পিছনে একটা দেয়াল আছে, হেলান দাও ওটায়।'

'চোখ দুটো কী বিড়ালের?'

'কোথায় কী আছে জানি আমি।'

পরদা সরাবার আওয়াজ শুনল রানা। তারপরই আলোর বন্যায় ভেসে গেল কামরাটা। রানার দিকে ফিরবার জন্য ঘুরল লিয়া, অমনি আঁতকে উঠল। 'ডিয়ার গড, এ কী অবস্থা তোমার!'

চোখ নামিয়ে নিজের কাপড়চোপড়ের দিকে তাকাল রানা। জ্যাকেট আর শার্ট কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে, রক্তে প্রায় ভেজা। হাঁটুর নীচে থেকে ট্রাউজারের একটা পা নেই, দ্বিতীয় পা হাঁটুর কাছে ছেঁড়া।

ধীরে ধীরে, সাবধানে, রানাকে পরীক্ষা করল লিয়া। মুখের কয়েক জায়গার চামড়া উঠে গেছে। কপালের একপাশ ফুলে আছে। ঘাড়ের পাশে কাঁধের উপর তিনটে গর্ত, তবে গভীর নয়। 'পাঁজরেও ক্ষত দেখছি...কী জানি হাড় ভেঙেছে কিনা। রানা, আমি ডাক্তার ডাকছি।'

একটা হাত তুলল রানা। 'ডাক্তার ডাকার কোন দরকার নেই। ফার্স্ট এইড লাগবে আমার, তার বেশি কিছু নয়। হাড়-টাড় ভাঙেনি, আমি জানি।'

'সেক্ষেত্রে ধরে নাও আমি তোমার নার্স,' বলল লিয়া। 'প্রথমে বাথটাবে শুইয়ে গরম পানিতে গোসল করাব তোমাকে, সত্যি কোন হাড় ভেঙেছে কিনা ওই সুযোগে দেখে নেয়া যাবে। কী?'

'তথাস্তু।'

দেড় ঘণ্টা পর। রানার সঙ্গে একই বাথটাবে লিয়াও গোসল করেছে। তার পরনে এই মুহূর্তে স্বচ্ছ কাপড়ের তৈরি নাইটি।

ওয়াশিং মেশিনে ধোয়া হয়েছে রানার কাপড়চোপড়। ড্রায়ার-এর সাহায্যে শুকিয়ে ইস্ত্রিও করে রেখেছে লিয়া। তবে রানাকে সে এখনও ওগুলো পরতে দেয়নি।

কুইন সাইজ বিছানায় পাশাপাশি বসে আছে ওরা, পা লম্বা করে হেলান দিয়েছে বালিশে। দু'জনের হাতে দুটো গ্লাস। পেইনকিলার পাওয়া যায়নি, ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিয়ে যতটুকু পারা যায় ব্যথা ভুলবার চেষ্টা করছে রানা।

গ্লাসে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে টুকটাক কথা হচ্ছে।

একসময় লিয়া জিজ্ঞেস করল: 'বাংলাদেশের হয়ে ঠিক কী কাজ করো তুমি, তরুণী মেয়ে খুঁজে বের করা আর ক্রিমিনালদের জেল থেকে বের করা বাদে?'

রানার ইচ্ছে হলো বলে: 'আমি মানুষ মারি।'

তবে বলল না। এখনও উপযুক্ত সময় আসেনি। 'একদিন হয়তো আমি তোমাকে বলব।'

রানা ভাবছে: ডিনারে বসে টাকার অঙ্কটা শুনে–পঞ্চাশ লাখ মার্কিন ডলার–কোন প্রতিক্রিয়াই হয়নি লিয়ার। অথচ ফাইল বা মাইক্রোফিল্ম পেতে হলে একটা সাইফার আর তার চাবি দরকার, এ-কথা শুনে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তীব্র।

এ-সবের পক্ষে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় লিয়া যদি মোসাদের

একজন এজেন্ট হয়।

কিন্তু তারপর রানা ভাবল, হামলাকারীরা হিব্রু ভাষায় কথা বলছিল। আর এতেও কোন সন্দেহ নেই যে ওকে তারা বন্দি করবার চেষ্টা চালালেও, লিয়াকে অবশ্যই খুন করতে চেয়েছিল।

ব্যাপারটা তা হলে মিলছে না। নিজেদের একজন এজেন্টকে কেন তারা খুন করবে?

করবে, করতে পারে, লিয়া যদি বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য অন্য কোন পক্ষের কাছে বিপুল টাকায় বিক্রি হয়ে গিয়ে থাকে।

বেডরুমের চারদিকে চোখ বুলাল রানা। টাকা-পয়সার কোন অভাব নেই লিয়ার: দামী ড্রেস, মূল্যবান পাথর বসানো ব্রেসলেট, অ্যান্টিক ফার্নিচার, মার্সিডিজ এবং ভিলা। এ-সব তো আর বেতনের টাকায় কেনা সম্ভব নয়।

'অনেক চিন্তা করেও কী যেন তুমি মেলাতে পারছ না,' রানার কানের লতিতে ঠোঁট ছোঁয়াল লিয়া।

'হ্যাঁ। ভাবছিলাম ইজরায়েলি লোকগুলো কী কারণে তোমাকে খুন করতে চাইছিল।'

'আমাকে? কী বলছ? আমি তো জানি আমাদের দু'জনকেই মারতে চাইছিল ওরা।'

'আমার তা মনে হয় না। ওদের কাউকে তুমি চিনতে পেরেছ?'

'না। তুমি বুঝলে কী করে যে ওরা ইজরায়েলি?'

'ওরা হিব্রুতে কথা বলছিল। ভাষাটা আমিও জানি।' রানার চোখ দুটো সরু হয়ে গেল। 'গোটা ব্যাপারটা নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছিলাম, বুঝলে।'

রানার কানের লতিতে ছোট্ট একটা কামড় দিল লিয়া। 'ও, তাই?'

'তুমি বোধহয় বারিকের সঙ্গে তখনও রেস্টুরেন্টের ব্যবসায়

নামোনি, তার আগেই মোটা টাকা কামিয়ে ফেলেছ, তাই না?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল রানা। 'একটা ডান্সফ্লোর আর রেস্তোরাঁর আয় থেকে এত কিছু হয় না।'

জোর করে হাসল লিয়া। 'অতীতে কারা আমার পুরুষ বন্ধু ছিল, সে-সব গল্প তোমাকে আমি শোনাচ্ছি না, বিশেষ করে তোমার সঙ্গে যখন বিছানায় রয়েছি।'

'লিয়া...'

কাত হয়ে রানার উপর নরম মাখনের মত গলে পড়ল লিয়া। 'চু-উ-উ-প। একদম চুপ!' চুমোয় চুমোয় অস্থির করে তুলল সে ওকে।

বোটে চড়ে মাইকোনোসে পৌঁছাতে ছ'ঘণ্টা লাগল। তটরেখা দেখতে পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করছে রানা, অনুভব করল কাল রাতের মারপিটের ধকলটা কাটিয়ে উঠেছে ও।

রাতে খুব একটা ভাল হয়নি ঘুম। সেটা পুষিয়ে নিতে পেরেছে ফেরিতে উঠবার পর আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে।

এই খানিক আগে ওর ঘুম ভাঙিয়েছে লিয়া। তার হাত থেকে নেওয়া কফির ধূমায়িত কাপে চুমুক দিচ্ছে। ওর পাশে বসে সৈকত দেখছে লিয়া।

সৈকতের সামনে বাড়িগুলো ধবধবে সাদা। খানিক পর পর একটা করে উইন্ডমিল দেখা যাচ্ছে। খুব কম কথা বলছে ওরা, কাল রাত সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি কেউ।

বিষয়টা নিয়ে আসলে আলোচনার কিছু নেইও। বিপরীত লিঙ্গের দু'জন সমর্থ মানুষ এক বিছানায় পাশাপাশি যখন শোয়, এরপর কী ঘটবে তা নিয়ে আর কথা কী।

তবে কাজের প্রসঙ্গও আর তোলেনি রানা। সকাল সকাল লিয়াকে জেরা করতে ইচ্ছে হয়নি ওর।

বিছানা ছাড়বার পর শাওয়ার সেরে, দাড়ি কামিয়ে আর

কাপড়চোপড় পরে আগেই তৈরি হয়ে নিয়েছিল রানা। লিয়াকে বলল: 'মাইকোনোসের বোট আটটায় ছেড়ে যাবে। টেলিফোন করে আমি একটা রেন্ট-আ-কার আনিয়ে নিচ্ছি! তুমি মার্সিডিজটা নেবে। আমাদের দেখা হবে বোটে।'

'আলাদাভাবে কেন?'

'দরকার আছে, তাই।'

ব্যাগ নেওয়ার জন্য হোটেলে ফিরে রানা দেখল ওর সমস্ত কাপড়চোপড় সার্চ করা হয়েছে। তবে কিছু খোয়া যায়নি। সার্চ করে যাই দেখে থাকুক, সে বা তারা ধাঁধা মেলাবার মত কিছু পায়নি।

ওয়ালথারটা রেখে গিয়েছিল মেইডের লিনেন ক্লজিটে, দেখা গেল সেখানে কারও হাত পড়েনি। অস্ত্রটা চেক করে কোমরে গুঁজল ও, গাড়িতে ফিরে রওনা হলো বোটের উদ্দেশে।

অস্টির ছেড়ে মাত্র মাইল তিনেক এগিয়েছে ওর গাড়ি, দেখা গেল পিছনে টিকটিকি লেগেছে। সাদা একটা ফিয়াট। ভিতরে তামাটে এক লোক, গাল দুটো গর্তে বসা, নাকের নীচে বেমানান চওড়া গোঁফ।

দু'মাইল এগিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় থামল রানা। ফিয়াট পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তবে ওর মন বলছে সামনের রাস্তায় আবার ওটাকে দেখতে পাওয়া যাবে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ওর গাড়ি কোর্টিনায় চড়ল রানা, স্টার্ট দিয়ে অপেক্ষায় থাকল। একটু পরেই পাশ কাটাল পরিচিত মার্সিডিজটা। আরও চারটে গাড়িকে যেতে দিল রানা, তারপর নিজেরটা ছাড়ল।

লিয়ার পিছু নেওয়া ফেউটাকে চেনা গেল সহজেই। দ্রুত আর খানিকটা বেপরোয়া ভঙ্গিতে গাড়ি চালাতে অভ্যস্ত লিয়া। কালো এসকর্ট নিয়ে নিঃসঙ্গ এক লোক তার মার্সিডিজের পিছনে থাকবার জন্য হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

নিজের রিয়ারভিউ-এ তাকাল রানা। ফিয়াট আবার ওর পিছু নিয়েছে।

মাত্র কয়েক মিনিট ফ্লাইং ব্রিজে ছিল রানা। এসকর্ট আর ফিয়াটের ড্রাইভার দু'জনকে বোটে উঠতে দেখে নেমে আসে, তারপর আরাম কেদারায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

ওর চিন্তায় বাধা পড়ল লিয়ার কথায়। 'গ্যাঙওয়ে নামানো হয়েছে।'

আরাম কেদারা ছেড়ে আড়মোড়া ভাঙল রানা। 'আমাদের ওয়াচ্‌গুলো নেমে গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল লিয়া। 'তবে একজন। তার মানে অপর লোকটা আমাদের পিছনে থাকবে।'

ব্যাগটা তুলল রানা। 'এসো।'

ট্যাক্সি নেওয়ার দরকার নেই, সৈকতের কাছাকাছি সব হোটেলেই অল্প হেঁটে পৌঁছানো যায়। পশ জেট-সেট এলাকাটা পাহাড়ে, নয়তো দ্বীপের উল্টোদিকের সৈকতে।

আরাম কম হলেও, সুসিনার কাছাকাছি থাকতে চাইছে রানা। ছোট একটা হোটেল পছন্দ করল ও। ডেস্কের দিকে এগোচ্ছে, লিয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'একটা কামরা, না দুটো?'

কাঁধ ঝাঁকাল লিয়া। 'তোমার ইচ্ছে।'

সৈকতের দিকে খোলা পাশাপাশি দুটো কামরা ভাড়া করল রানা। খাতায় নাম লিখাবার সময় ডেস্ক ক্লার্ক অবাক হয়ে বার বার ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। নিজের কামরায় ঢুকবার পর আয়নার সামনে দাঁড়াতে কারণটা জানা গেল।

সকালে ঘুম থেকে উঠবার পর থেকে ওর মুখের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। 'লিয়া।'

'বলো।' দুই কামরার মধ্যবর্তী দরজায় হাজির হলো লিয়া।

'দেখো তো, এটার কোন ব্যবস্থা করতে পারো কি না।'

মেকআপ বক্সের সাহায্য নিয়ে মুখটার উপর প্রায় এক ঘণ্টা

কাজ করল লিয়া। তারপর বড় আকারের একজোড়া সানগ্লাস পরল রানা। এখন আর কেউ অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাবে বলে মনে হয় না।

চেয়ার ছেড়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। সরাসরি নীচে প্রধান সড়ক, আঁকাবাঁকা একটা রেখা ধরে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে দ্বীপটাকে। ওটার সামনে সারি সারি শপিং মল, যতদূর দৃষ্টি যায়। ওগুলোর উল্টোদিকে সৈকত।

এখন বেড়ানোরই মরশুম, তবু প্রায় খালি পড়ে আছে বালুকাবেলা। বিদেশী ট্যুরিস্ট যারা মাইকোনোসে ছুটি কাটাবার আর্থিক সামর্থ্য রাখে তারা এখনও এসে পৌঁছায়নি।

তারপর লোকগুলোকে দেখতে পেল রানা। কয়েকটা চেঞ্জিং কেবিনের কাছাকাছি বালিতে বসে সিগারেট ফুঁকছে আর মাঝেমধ্যে মুখ তুলে হোটেলটার দিকে তাকাচ্ছে।

'ওরা পিছু ছাড়েনি...সারাক্ষণ নজর রাখছে,' বলল রানা।

জানালায়, রানার পাশে এসে দাঁড়াল লিয়া। 'এই লোকগুলো অন্তত ইজরায়েলি নয়,' বলল সে। 'মানে দেখে তা মনে হচ্ছে না আর কী।'

'না। লোকগুলো স্থানীয়। ওদেরকে শুধু নজর রাখবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমাদের গতিবিধি সম্পর্কে রিপোর্ট করবে কাউকে।'

'তা হলে উপায়?' লিয়া উদ্বিগ্ন। 'ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে মেয়েটার কাছে আমরা পৌঁছাব কীভাবে?'

'চিন্তা কোরো না, উপায় আছে,' বলে ব্যাগ খুলে সাদা একটা সুট বের করল রানা। 'এটা পরছি, সবাই যাতে এই সাদা সুট দেখে চেনে আমাকে। শোনো, তোমাকে কী করতে হবে বলে দিচ্ছি...'

হাত ধরাধরি করে কাস্তে আকৃতির হারবারে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা।

তাজা ফুল আর সদ্য তৈরি রুটির সোঁদা গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। মাঝে মধ্যে কোন দোকানে হয়তো ঢুকছে ওরা, কিংবা খানিক দাঁড়িয়ে দোরগোড়ার পাশে বসা কারিগরদের হাতের কাজ দেখছে।

মস্ত একটা হ্যাট কিনল রানা, প্রায় সুটটার মতই সাদা। আরও কিনল নতুন একজোড়া সানগ্লাস।

ধীরে ধীরে সাগরের দিকে সরে আসছে ওরা। হঠাৎ লিয়াকে ধরে ঘোরাল রানা, টেনে নিয়ে এল একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে। 'ওঠো, জলদি।' লিয়ার পিছু নিয়ে নিজেও উঠে পড়ল ব্যাকসিটে, সামনের দিকে ঝুঁকে ড্রাইভারকে বলল: 'জেটির দিকে। আমরা জেলেদের বারে যেতে চাই-পুরানোটায়।'

ঝাঁকি খেয়ে রওনা হলো ট্যাক্সি। পিছন দিকে তাকিয়ে রানা দেখল প্রহরী দু'জন আরেকটা ট্যাক্সিতে চড়ছে।

একেবারেই অ্যামেচার, ভাবল ও।

সাপের মত আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে ছুটছে ওদের গাড়ি। পুরানো শহর আর বোট হারবার ক্রমশ কাছে চলে আসছে।

বিশ মিনিট পর বিধ্বস্ত চেহারার নড়বড়ে একটা দালানের সামনে ঝাঁকি খেয়ে থামল ট্যাক্সি। ওটার দাগ ওঠা কপালে মরচে ধরা একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে, কিন্তু এত ঝাপসা যে নামটা পড়া গেল না।

'মাইকোনোসে এটাই সবচেয়ে পুরানো জেলেদের বার,' বলল ড্রাইভার। 'তবে সাবধান কিন্তু!'

'মানে?'

'না, মানে, সাধারণত বিকেলের দিকে মারপিট একটা বাধেই। যে-সব জেলে রাতে মাছ ধরে তারা ওই সময়টায় নেশা করে কি না।'

'পিছন দিক দিয়ে বেরুনো যায়?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, একটা গলিতে।'

'গাড়ি নিয়ে ওখানে চলে যাও।'

ড্রাইভারের চেহারায় সন্দেহের গাঢ় ছায়া পড়ল, তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মেঘ কেটে গেল রানা সামনের সিটে এক মুঠো ড্রাকমা ছড়িয়ে দিতে।

দালানটা মান্ধাতা আমলের, ভিতর দিকের দেয়াল কাঠের প্যানেল দিয়ে ঢাকা। কাউন্টার বা বারটাও কাঠের। মাঝখানে দশ-বারোটা টেবিল আর বেঞ্চ ফেলা। বুদগুলো দেয়াল ঘেঁষা। বাতাসে ঘাম, সিগারেট আর মদের তীব্র ঝাঁঝ।

'এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে?' ফিসফিস করল লিয়া।

'এই জায়গাটাই দরকার আমাদের।' পথ দেখিয়ে তাকে একটা বুদে নিয়ে এল রানা।

হাত ভর্তি উল্কি, কম করেও তিন মণ ওজন হবে, বুদে ঢুকে দু'কোমরে হাত রাখল ওয়েটার। 'খাওয়া নেই।'

'উজো দাও। দুটো।' গ্রিসের বিখ্যাত পানীয় উজো, বেশ কড়া।

পায়ের থপ্ থপ্ আওয়াজ তুলে ফিরে গেল ওয়েটার। আবার থপ্ থপ্। একটা বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে এসেছে। 'দশ হাজার ড্রাকমা।'

'অ্যাই, মগের মুল্লুক নাকি?' মারমুখো হলো রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল দৈত্য। 'চার হাজার ড্রাকমা।'

লোকটার মাংসল হাতে চার হাজার দুশো ড্রাকমা গুঁজে দিল রানা। সে চলে যেতে গ্লাসে উজো ঢালল ও। পরস্পরের গ্লাস ক্লিক করল ওরা।

'কী জানি প্ল্যানটায় কাজ হবে কি না,' বিড়বিড় করল লিয়া।

'হবে। ওদের দৃষ্টিপথ খুব সরু, বাইরে থেকে ভেতরটা সামান্যই দেখতে পাচ্ছে।'

চশমার উপর দিয়ে কামরার চারদিক ভাল করে দেখছে রানা। বেঞ্চে বসে আছে আট জোড়া জেলে। একটা বুদে বসেছে চারটে

কলগার্ল।

আরেকটা বুদে তাস খেলা চলছে। তারা চারজন।

মাত্র তিনজন লোক একা বসে মদ খাচ্ছে। বার-এর সামনে বসা লোকটা প্রায় ওয়েটারের মতই প্রকাণ্ডদেহী। সে বাদ। দ্বিতীয় লোকটাকে রানা আগেই লক্ষ করেছে, বুদে বসবার সময়। সে-ও বাদ... বেশ খাটো আর রোগা। তা ছাড়া, লোকটার দাড়ি আছে।

কামরার উল্টোদিকে, শেষ বুদটায়, ক্যাপ পরা একটা মাথা দেখা যাচ্ছে। মাঝে মধ্যে তার কাঁধও চোখে পড়ছে–বেশ চওড়া আর পেশল বলে মনে হলো। গায়ে ডেনিম জ্যাকেট।

'এখুনি আসছি,' বলে বুদ থেকে বেরিয়ে এল রানা।

কামরাটা পার হচ্ছে ও। লোকটার বুদকে পাশ কাটিয়ে হলওয়েতে বেরিয়ে এল। এখানে আলো খুব কম। পুরুষদের টয়লেট বাম দিকে, মেয়েদের ডান দিকে। নাক বরাবর সামনে একটা দরজা, নোংরা কাঁচ ভেদ করে ভিতরে রোদ ঢুকছে।

বাইরে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল রানা। দরজা থেকে দশ ফুট দূরে ওর ট্যাক্সি। হুইলের পিছনে বসে খবরের কাগজ পড়ছে ড্রাইভার।

দরজায় তালা দেওয়া নেই দেখে খুশি ও। হলওয়ের সামনের অংশে ফিরে এল। গাঢ় ছায়ায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ওর বাছাই করা লোকটাকে দেখছে।

লোকটা ছ'ফুট এক কি দু'ইঞ্চি হবে। গঠন আর আকৃতি রানার সঙ্গে মেলে, তবে ওজনে বিশ পাউন্ড বেশি হবে।

সাদা সুটটা পরলে অতিরিক্ত ওই বিশ পাউন্ড কারও চোখে পড়বে না। মানিয়ে যাবে কালো চুল। খোঁচা খোঁচা দাড়ি? ওটা দূর থেকে দেখে বোঝা যাবে না। তা ছাড়া, মস্ত হ্যাটটা নিচু করে পরলে মুখ ঢাকবার কাজ করবে।

ক্যাপ আর ডেনিম জ্যাকেট ছাড়াও লোকটা ফিশারম্যানস বুট, জিনস আর কালো টার্টলনেক সোয়েটার পরে আছে।

হেঁটে এসে বুদটার সামনে থামল রানা। মাত্র একটা চোখ তুলে সাদা সুটে দৃষ্টি বুলাল লোকটা।

'জেলে?'

ঘোঁৎ!

'বসলে কিছু মনে করবে?'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ।

লোকটার উল্টোদিকের সিটে বসল রানা। 'তোমাকে দু'ঢোক খাওয়াই আমি?'

নিজের খালি মগটা দিয়ে টেবিলের কিনারায় ঠকাস করে আওয়াজ করল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই থপ্ থপ্ ।

'ঢালাঢালির দরকার নেই...গোটা একটা বোতল নিয়ে এসো,' অর্ডার দিল জেলে।

হাসল রানা। কেউ যখন বিনা পয়সায় খাওয়াতে চায়, গোটা একটা বোতল নয় কেন? ওয়েটার বোতল নিয়ে আসতে পাওনা মিটিয়ে দিল ও সে চলে যাওয়ার পর যত্নের সঙ্গে মগে উজো ঢেলে লম্বা একটা চুমুক দিল জেলে।

'মাসুদ,' বলল রানা।

'জিসকা।' ঢক ঢক করে মগ খালি করে ফেলল লোকটা।

'ভাল খাবে, প্রচুর পান করবে, তার ওপর সুন্দরী একটা মেয়ের সঙ্গে বিকেলটা কাটাবে–আইডিয়াটা কেমন?'

'তুমি মেয়ে মানুষের দালাল? আমি নিঃস্ব।'

'সেই সঙ্গে বেশ কিছু টাকাও পাবে।'

'আমি নিরীহ জেলে। আইন মানি। চোরাচালান কবে ছেড়ে দিয়েছি। যাও, ভাগো।'

টেবিলের উপর চারটে কড়কড়ে নোট রাখাল রানা–সব মিলিয়ে দু'লাখ ড্রাকমা।

'ঠিক আছে, কী পাচার করতে হবে শুনি?' পোকা ধরা দাঁত বের করে হাসছে জিসকা।

'কিছুই পাচার করতে হবে না। খানাপিনা সব আমার খরচে।'

'আর সুন্দরী মেয়েমানুষ?'

'ওটা তোমার নাগালের বাইরে। ওকে তুমি শুধু এসকর্ট করবে, যেখানে বলে সেখানে নিয়ে যাবে।'

'আচ্ছা। কখন?'

'এখনই, কিংবা একটু পর। আমি চাই তুমি আমার সঙ্গে কাপড়চোপড় বদল করো। সুটটা ফিরিয়ে না দিলেও চলবে।'

'এ তো দেখছি ভারী মজা!' হেসে উঠল জিসকা। 'কিন্তু আমার কাপড়ে যে মাছের গন্ধ, তার কী হবে?'

'কাউকে বোকা বানিয়ে মজা পেতে চাইলে একটু কষ্ট তো করতেই হবে,' বলল রানা। 'আবার যখন ফিরে আসব, তুমি আমার পিছু নেবে।'

কামরাটা পার হওয়ার সময় হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল রানা। সত্তর কি পঁচাত্তর মিনিট পর চারদিক অন্ধকার হয়ে যাবে।

'কী হলো?'

'পেয়েছি একজনকে,' জবাব দিল রানা। 'ওদের কেউ চেক করতে ভেতরে ঢুকেছিল?'

মাথা নাড়ল লিয়া। 'শুধু একবার মাথা গলিয়ে চোখ বুলাল একজন। আমাকে দেখতে পেয়ে পিছিয়ে গেল।'

'দ্বিতীয় লোকটা সম্ভবত ট্যাক্সির ওপর নজর রাখতে পিছন দিকে চলে গেছে।'

'তোমার বিশ্বাস সত্যি ওরা টোপটা খাবে?'

'না খেয়ে পারবে না,' বলল রানা। 'মনে আছে তো, তোমাকে কী করতে হবে?'

'পাহাড়ের ওপরে সবগুলো বারে ঢুঁ মারব··· নাচানাচি করব··· তারপর প্রচুর সময় নিয়ে ডিনার খাব··· অনেক রাত করে ফিরব হোটেলে···'

'লক্ষ্মী মেয়ে। আর মনে রেখো, সব সময় অন্ধকার জায়গায়

বসবে।'

বুদ থেকে বেরিয়ে আসবে রানা, ওর কবজি চেপে ধরল লিয়া। 'রানা?'

'বলো।'

'তুমি ঠিক জানো এই লোক পাগল বা রেপিস্ট নয়?'

'হলেই বা কী?' রানা জবাব দিল ঠাণ্ডা সুরে। 'শাইখ আর আমাকে যদি তুমি খুন করতে পারো, মাতাল একজন জেলেকে না পারার কী আছে?'

রানার পিছু নিয়ে টয়লেটে ঢুকল জিসকা। পরস্পরের কাপড় বদল করল ওরা, যার পকেটে যা ছিল বুঝে নিল দু'জনেই।

'সত্যি, দারুণ মানিয়েছে তোমাকে,' বলল রানা, লোকটাকে ঘুরিয়ে দেখছে। 'কোটের বোতাম লাগাও। আরেকটু নিচু করো হ্যাট।'

'হয়েছে?' নির্দেশ পালন করল গ্রিক জেলে।

শেষবারের মত তাকে পরীক্ষা করল রানা। 'এটা পরো।' জিসকার নাকে সানগ্লাস বসিয়ে দিল। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'বাহ্।'

'তুমি ভাই স্রেফ একটা পাগল! তবে পাগলামির বশে আরও যদি কিছু দাও, আমি নিতে আপত্তি করব না। মেয়েটা কে?'

'বন্ধুর বোন। ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার কোরো। চলো এবার!'

ওদের জন্য করিডরে অপেক্ষা করছে লিয়া। নার্ভাস।

'জিসকা...লিয়া বারকা...জিসকা। যাও, সময়টা তোমরা উপভোগ করো।'

পথ দেখাল লিয়া, তার পিছনে ছায়ার মত সেঁটে থাকল জিসকা, নির্দেশ অনুসারে একটু কুঁজো হয়ে আছে সে।

জানালা দিয়ে ওদেরকে ট্যাক্সির ব্যাকসিটে চড়তে দেখল রানা। ইঞ্জিন জ্যান্ত হওয়ার আওয়াজ শুনল। গাড়িটা মাত্র চলে গেছে, এক লোককে দৌড়ে জানালাটাকে পাশ কাটাতে দেখল ও।

পনেরো মিনিট অপেক্ষা করল রানা, তারপর নিজেও বেরিয়ে এল গলিতে।

সাত

সন্ধে না হওয়া পর্যন্ত পুরানো শহরে হাঁটাহাঁটি করল রানা। তারপর খুব সহজেই খুঁজে বের করল হারামা স্ট্রিট। ওকে শুধু লোকজনের হইচই আর বাদ্যজনিত কোলাহল অনুসরণ করতে হলো।

হারামা স্ট্রিট আর তার দুই শাখা দীর্ঘ শরীরে ধারণ করে আছে ডজন ডজন সেক্স শপ, ডান্সিং বার, সরাইখানা, কাফে, নাইট ক্লাব, ফ্যাশন হাউস আর হোটেল। প্রতিটি প্রবেশ পথ বা দোরগোড়া পেরুবার সময় বুজুকির শব্দে কানের পরদা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। বুজুকিকে ম্যান্ডোলিন-এর গ্রিক সংস্করণ বলা যেতে পারে।

হারামা স্ট্রিটের প্রায় শেষ মাথায় বারো নম্বর। এটা নামকাওয়াস্তে একটা হোটেল, আড়ালে দেহ ব্যবসা চলছে। লোহার গ্রিল দিয়ে তৈরি বেড়া আছে, তবে গেট নেই। ভিতরে ছোট উঠান, মেঝেটা পাকা নয়। এক ধারে দু'তিনটে পাম গাছ দাঁড়িয়ে আছে। দালানে ঢুকবার মুখটা টানেলের মত। ভিতরে কম পাওয়ারের একটা হলুদ বালব জ্বলছে।

দালানটা পাঁচতলা। চুনকাম অনেক আগেই উঠে গেছে। শাটারের সবুজ রঙও এখন কালচে।

সোজা হাঁটছে রানা। তবে হারবারের দিকে না গিয়ে বাঁক নিল, সরু একটা গলি পার হয়ে চলে এল বারো নম্বর দালানটার পিছনে। এদিকে একটা হোটেল দেখা যাচ্ছে, নীচতলায় বুজুকি বার অ্যান্ড ক্লাব। কোন লাভ হবে না, ভাবল ও, যদি না ভিতর দিয়ে এক হোটেল থেকে আরেক হোটেলে যাওয়ার পথ থাকে।

আবার বারো নম্বরের সামনে চলে এল রানা। কেউ ওকে লক্ষ করছে না, নিশ্চিত হয়ে উঠানটায় ঢুকল। টানেলের শেষ মাথায় একটা দরজা দেখল ও–কবাটে নকারটা উন্নত স্তন আকৃতির। ওটা ধরে দু'বার ঠুকল ও।

আই লেভেলে একটা পিপহোল খুলে গেল। 'কী চাই?'

'তোমরা খোলা, না বন্ধ?'

ফাঁকটার পিছনে নীলচে চোখ সময় নিয়ে রানার মুখ পরীক্ষা করল, কাপড়চোপড় দেখল, তারপর বোল্ট সরিয়ে খুলে দিল দরজা। 'তুমি গ্রিক নও।' নধর স্বাস্থ্য নিয়ে সামনে দাঁড়াল এক মেয়ে। কালো ড্রেস এত আঁটো যে ছিঁড়ে যেতে পারে। কপালের পাশে ছোট্ট একটা টিউমার।

'মেক্সিকান,' জবাব দিল রানা। 'নাবিক। তুমি মাদাম গ্লোরিয়া?'

'না। মাদাম গ্লোরিয়া পাহাড়ের ওপর বড় ব্যবসাটা দেখাশোনা করে।'

'তবে এই ব্যবসাটাও তো মাদাম গ্লোরিয়ার, তাই না? আমার সঙ্গী বলল, ভাল মেয়ে শুধু তার কাছেই পাওয়া যাবে।'

'হ্যাঁ, এটাও তার জায়গা। তুমি মদ খেয়েছ?' সামনের দিকে ঝুঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার চোখে তাকাল মেয়েটা।

'এই একটু উজো।'

'ঠিক আছে। সঙ্গে মালপানি আছে তো?'

টাকার বান্ডিল দেখাল রানা।

'বেশ। ভেতরে এসো।'

ভিতরটা বেশ পরিপাটি। বার-কাম-ওয়েটিং রুম যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন। টেবিল আর চেয়ার মাঝখানে, সেটিগুলো দেয়াল ঘেঁষে। প্রায় নগ্ন দশটা মেয়েকে সেটিতে বসে থাকতে দেখল রানা। আলো কম হওয়ায় কারও চেহারাই স্পষ্ট নয়।

'এখনই মেয়ে নেবে? না কি প্রথমে গলা ভেজাতে চাও?'

'চাই।'

'বেশ। তারপর একটা মেয়েকে বেছে নিয়ো। সবাই পরিচ্ছন্ন, সবাই ভাল। তোমার পছন্দ হবে,' বলে চলে গেল টিউমার।

বাতাসে সস্তা সেন্ট, ঝাঁঝাল মদ আর মশলার গন্ধ। বারে এসে দাঁড়াল রানা। আরও দু'জন খদ্দের আছে। একজন হাড্ডিসার তরুণ, আরেকজন পেটমোটা আধ বুড়ো। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে দু'জনেই তারা মাথা নত করল। তবে এক মুহূর্ত পর আবার নিজেদের কাজে ফিরে গেল তারা–মেয়েগুলোকে হাঁ করে গিলছে।

রানাকে টুলে বসতে দেখে এগিয়ে এল বারম্যান। 'ড্রিঙ্ক?' শারীরিক গঠন আর হাবভাবই বলে দিল লোকটা বক্সার। রানাকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ধরে নিয়ে কাপড়ের উপর চোখ বুলাচ্ছে। পিস্তল বা অন্য কোন অস্ত্র থাকলে ফোলা ভাব চোখে পড়বে–ব্যস, ঝগড়া বাধাবার একটা অজুহাত পেয়ে যাবে সে।

'উজো দাও এক গ্লাস।'

গ্লাসটা এল, ইতিমধ্যে প্রায় অন্ধকার জায়গাটা রানার চোখে সয়ে এসেছে। এক এক করে মেয়েগুলোকে পরীক্ষা করছে ও। সব রকমই আছে এখানে: লম্বা, খাটো, মোটা, রোগা, লালচুলো, স্বর্ণকেশিনী। তবে কারও মাথায় কালো চুল নেই।

হাড্ডিসার তরুণ সবচেয়ে স্বাস্থ্যবতী মেয়েটাকে পছন্দ করল। তাকে প্রায় বগলদাবা করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটা, হাইহিলের খটখট আওয়াজ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।

করিডরের কোথাও একটা দরজা খুলবার আওয়াজ পেল

রানা। এক সঙ্গে অনেকগুলো নারী কণ্ঠ কলকল করে উঠল। খিক খিক করে হাসল দু'একজন। তারপর দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চাপা পড়ে গেল সব কোলাহল।

মেয়েগুলো আগ্রহ নিয়ে দেখছে রানাকে। ওর প্রতিটি নড়াচড়া দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করছে তারা। মুখ তুলে আবার তাদের সবাইকে ভাল করে দেখল রানা। বলা তো যায় না, এদের মধ্যে অনেকেই হয়তো পরচুলা পরে আছে। কিংবা হয়তো চুল রঙ করেছে।

তবে না, এদের মধ্যে সুসিনা নেই।

'পছন্দ হলো?' ফিরে এল টিউমার, হাবভাবে একটু রাগ রাগ ভাব।

'আমার রুচি একটু উদ্ভট,' জবাব দিল রানা। পকেট থেকে ছোট্ট, চ্যাপ্টা একটা ক্যামেরা বের করল।

কাঁধ ঝাঁকাল মাদাম গ্লোরিয়ার ম্যানেজার। 'সবাই আলাদা। আমরা কাউকে হতাশ করি না। কোনটাকে তোমার দরকার?'

একটা মেয়ের দিকে হাত তুলল রানা। তার মাথায় যেন আগুন ধরে গেছে। পাশের মেয়েটিকেও দেখাল ও। এর চুল সোনালি।

'তুমি দুটো মেয়ে চাও?'

'আসলে...তিনটে। মানে, একটা মেয়ের চুল কালো হতে হবে।'

'কালো চুল... কালো চুল...'

'চোখও।'

'ওহ্, আছে!' ম্যানেজার উৎফুল্ল হয়ে উঠল। 'ওর নাম সুসিনা। কিন্তু এখন সে ব্যস্ত।'

'আমি অপেক্ষা করব।'

মেয়ে দুটোকে ইশারা করল ম্যানেজার। তারপর রানাকে বলল, 'এসো, তোমাকে কামরায় দিয়ে আসি।'

তার পিছু নিল রানা, ওর পিছু নিল মেয়ে দুটো। একটা হলওয়ে পার হয়ে সিঁড়ি ধরল ওরা। যত উপরে উঠছে, পারফিউম-এর গন্ধ বাড়ছে ততই।

'এদিকে। সবচেয়ে বড় কামরা এটা।' দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল টিউমার।

কামরাটা সত্যি বড়। ফার্নিচার পুরানো হলেও, আরামদায়ক। বেশিরভাগ দেয়ালই আয়নায় মোড়া। বিছানাটা এত বড় যে অনায়াসে চারজন শোয়া যাবে।

'এটা স্পেশাল কামরা, তাই ভাড়াও বেশি।'

'কত?'

'এই কামরা আর তিনটে মেয়ে, এক ঘণ্টার জন্যে...' মনে মনে হিসাব করছে বিদেশী খদ্দেরের কাছ থেকে ঠিক কত খসানো যাবে। 'পেসোয়?'

'আমার কাছে দেশী মুদ্রা নেই। ড্রাকমায় বলো।'

'পঞ্চাশ হাজার।'

পঞ্চাশ হাজারই দিল রানা।

মেয়ে দুটোকে স্থানীয় গ্রিক ভাষায় হড়বড় করে কী সব বলল ম্যানেজার, তারপর রানার দিকে ফিরল: 'তুমি ঠিক কী চাও, ওদেরকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। ছবি তোলা ছাড়াও তোমার সব কথাই শুনবে ওরা। এখানে কাউকে আমরা ঠকাই না। অপর মেয়েটাকে একটু পরেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

সে বেরিয়ে যেতেই অনুমতির তোয়াক্কা না করে মেয়ে দুটো তাদের কাপড় খুলে ফেলল। সেদিকে একবারও সরাসরি না তাকিয়ে, তৃতীয় মেয়েটা না আসা পর্যন্ত, ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত থাকবার ভান করছে রানা।

'তুমি কি সত্যি শুধু ছবি তুলবে?' মাথায় আগুন নিয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জানতে চাইল প্রথম মেয়েটা।

'আপাতত।' জোর করে একটু হাসল রানা। আড়ষ্টভঙ্গিতে

ওদেরকে দেখাল কীভাবে পোজ নিতে হবে, তারপর একটা ছবি তুলল।

তৃতীয় মেয়েটা আসছে না, এদিকে সময়ও কাটছে না। অগত্যা একের পর এক এদেরই ছবি তুলছে ও।

এক সময় দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল একটা মেয়ে। তার চুল আর চোখ দুটোই কালো।

'সুসিনা?' জিজ্ঞেস করল রানা, নিজের অজান্তেই কণ্ঠস্বর নরম, প্রায় কাতর হয়ে গেছে।

মেয়েটার মাথা ঝাঁকানোর ভঙ্গিটায় বোকা বোকা ভাব।

'ও বোবা, কথা বলতে পারে না,' লালচুলো মেয়েটা বলল। 'তবে শুনতে পায়। কী কারণে কে জানে, ওর মাথা ঠিকমত কাজ করে না। আমাদের ম্যাডাম ওকে বহু কষ্টে কিছু কিছু কাজ শিখিয়ে নিয়েছেন।'

দ্বিতীয় মেয়েটা, সোনালি চুল, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গ্রিক ভাষায় কী যেন বলল, উত্তরে মাথা ঝাঁকাল সুসিনা। কামরার একমাত্র জানালার পাশে ফেলা চেয়ারটার কাছে হেঁটে গিয়ে বিবস্ত্র হতে শুরু করল সে।

রানার বুকটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে উঠল। হায়, ভাবল ও, হাসিখুশি মানুষ সামি কাদরির মেয়ের এ কী করুণ পরিণতি!

একবার ভাবল, সুসিনাকে বলে সব কাপড় খুলবার দরকার নেই। পরমুহূর্তে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। এমন কিছু করা চলবে না, এখানকার কেউ যাতে বুঝতে পারে সুসিনার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি বা দুর্বলতা আছে ওর।

আঠারো কি উনিশ বছর বয়স, সুসিনার দেহসৌষ্ঠব এতটাই নিখুঁত যে মেয়ে দুটো একবার তাকাবার পর আর চোখ ফেরাতে পারছে না।

রানাকেও একসময় তাকাতে হলো। তবে ওর কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। ক্যামেরা নিয়ে মেয়েটার পিছনে চলে এল

ও। তারপর দেখতে পেল–আছে, সত্যি উল্কিটা আছে। উড়ন্ত একটা প্রজাপতি।

'সুসিনাকে দিয়ে কী করাতে চাও তুমি?' একসময় সোনালি চুল জানতে চাইল।

'পোজ।'

ক্যামেরায় নতুন ফিল্ম ভরে সুসিনার বিশটা ছবি তুলল রানা। সুসিনা পোজ দিল চেয়ারে, মেঝেতে, টেবিলে–সবই উজ্জ্বল আলোর কাছাকাছি।

'ঠিক আছে, ধন্যবাদ,' প্রায় সমীহের সুরে সুসিনাকে বলল রানা। 'এবার তোমরা কাপড় পরো।'

'ব্যস? খেল খতম?' লালচুলো মেয়েটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জানতে চাইল। 'তুমি আর কিছু চাও না?'

'আমার শুধু ছবিই দরকার ছিল,' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বলল রানা।

মেয়ে দুটো হাসতে হাসতে পরস্পরের গায়ে ঢলে পড়ছে, নিচু গলায় রানার পুরুষত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছে।

সুসিনা অবশ্য হাসছে না। কাঁধ জোড়া একটু ঝাঁকিয়ে চুপচাপ কাপড় পরছে সে।

তিনজনকেই ভাল বকশিশ দিল রানা। তারপর বাথরুমটা কোনদিকে জেনে নিয়ে বেরিয়ে এল হলে। হল থেকে দালানটার পিছন দিকে এগোচ্ছে ও।

যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে বুজুকির আওয়াজ। এই দালান সংলগ্ন হোটেলের বুজুকি বার থেকে আসছে ওই বাজনা। শব্দটাকে রানা অনুসরণ করছে হরিণের গন্ধ পাওয়া একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত।

হলের শেষ মাথায় তিনটে দরজা। ধাক্কা দিতেই প্রথমটা খুলে গেল।

এ সেই হাড্ডিসার তরুণ আর স্বাস্থ্যবতী মেয়েটা। 'সরি, বলে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল রানা–যাই দেখে থাকুক, মন

থেকে মুছে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে।

দ্বিতীয় দরজাটা বাথরুমের।

তৃতীয়টায় তালা দেওয়া। ওটার কবাটে কান পাতল রানা। বুজুকির আওয়াজ এই দরজার ওদিক থেকেই আসছে, কোন সন্দেহ নেই।

রানা ধারণা করল, ওপারে সিঁড়ি আছে। তবে ধারণায় কাজ চলবে না, ওকে নিশ্চিত হতে হবে।

ওর রিঙের তৃতীয় ইস্পাতের কাঠি দিয়ে খোলা গেল তালাটা। দরজা ফাঁক হলো।

কী আশ্চর্য! ঠিক যা চেয়েছে রানা। একটা সিঁড়ি, সোজা নীচে নেমে গেছে। বারের ভিতর দিয়ে এটা আসলে ব্রথেল-এর পিছন দিকের পথ।

'এই, কী করছ তুমি?'

বন করে ঘুরল রানা, দরজাটা নিজের পিছনে বন্ধ করে দিল।

এ হলো সেই ওয়েটার, রানা যাকে বক্সার বলে ধরে নিয়েছিল। লোকটার শরীরের সব পেশি আড়ষ্ট হয়ে আছে, চোখে-মুখে এত অসন্তোষ যে বরফ পর্যন্ত বুঝি গলে যাবে। তার ঠিক পিছনেই রয়েছে বিষাক্ত টিউমার। দু'জনেই পড়িমরি ভঙ্গিতে রানার দিকে এগিয়ে আসছে।

'বাথরুম,' বলল রানা, চোখে-মুখে স্বাভাবিক একটা ভাব ধরে রাখবার চেষ্টা করছে।

'তুমি দরজাটা খুললে কী মনে করে? ওটা তো প্রাইভেট দরজা।'

লোকটা আর মাত্র তিন ফুট দূরে। রানা জানে, সে থামবে না। 'বুঝতে পারিনি।'

'মিথ্যেকথা!'

রানা লোকটার পেটে কবজি পর্যন্ত সেঁধিয়ে দিল। তারপর, প্রতিপক্ষ কুঁজো হতে, ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে মুখে একটা গুঁতো

মারল।

টিউমার চিৎকার করে মাথায় তুলল পাড়া, ছুটে এসে রানার মুখ লক্ষ্য করে হাত চালাল সে, নখ দিয়ে চোখ তুলে নিতে চাইছে। খপ করে হাতটা ধরে দেয়ালের সঙ্গে তাকে সেঁটে রাখল রানা।

দাঁত দিয়ে রানার ঘাড় কামড়ে ভ্যাম্পায়ারের ভূমিকা নিতে চাইছে বিষাক্ত টিউমার। একই সঙ্গে ওর উরুসন্ধিতে একটা লাথিও কষেছে।

হলের এ-পাশ ও-পাশ থেকে দরজা খুলে গেল। ছিটকে বেরিয়ে এল নগ্ন মেয়েরা। তাদের পিছু নিয়ে পুরুষরাও, সচল অবস্থায় বৃথাই কোমরে প্যান্ট আটকাবার চেষ্টা করছে।

টিউমার ধস্তাধস্তি করে ব্যস্ত রাখছে রানাকে। হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিল রানা। একটু হকচকিয়ে গেল টিউমার। পরমুহূর্তে রানার ডান হাতের উল্টোপিঠটা সবেগে এসে লাগল তার চোয়ালে। জ্ঞান হারিয়ে ছিটকে পড়ল সে।

ভিড় ঠেলে হলের ভিতর দিয়ে ছুটল রানা। সিঁড়ি বেয়ে নামছে, দালানটার সদর দরজায় পৌঁছাতে চায়। সমস্ত চিৎকার চেঁচামেচি ওর পিছনে পড়ে থাকল।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। এই মাত্র ল্যান্ডিঙে পৌঁছাল চারজন হোঁৎকা আমেরিকান নাবিক, ধাপ বেয়ে উপরে উঠছে। ওদেরকে এড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো রানা। ওর একটা কাঁধ স্বেচ্ছায় বুক পেতে নিল একজন, ছিটকে দেয়ালে ধাক্কা খেল ও।

'ব্যাটা কেলে ভূত! চোখে দেখিস না, ধাক্কা দিলি যে?' তেড়ে এল শ্বেতাঙ্গ ষণ্ড। চোখে-মুখে বেপরোয়া, হিংস্র ভাব। চওড়া কাঁধ দুটো নীল জাম্পারটাকে টেনে বড় করে রেখেছে।

বাকি তিনজন বাঁকা চাঁদ হয়ে দাঁড়াল, রানার পথ আগলে। চারজনকেই খুঁটিয়ে দেখল ও। প্রত্যেকের চোখে উজোর নেশা।

এক ধার দিয়ে কুঁকড়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল রানা।

নীল জাম্পার ওর একটা হাত ধরে ফেলল। 'কথা কানে যায় না? ধাক্কা দিলে কেন?'

'সরি,' বলল রানা, ঝামেলায় জড়াতে চাইছে না। 'যেতে হচ্ছে।'

'চোপ!' নীল জাম্পার লাথি চালাল।

দ্রুত পিছিয়ে এল রানা। এই সুযোগে আরেক ছোকরা ওর হাত ধরে ফেলল, শিরদাঁড়ার কাছে নিয়ে গিয়ে মোচড়াচ্ছে।

ঠিক তখনই উপরতলা থেকে বক্সার ওয়েটারের হুংকার ভেসে এল। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সে।

'আমি চাই না তোমরা কেউ জখম হও,' ভারী আর গম্ভীর শোনাল রানার কণ্ঠস্বর।

'শোনো, শোনো, শালা বাণী দিচ্ছে!'

হেসে উঠে নীল জাম্পার আবার লাথি চালাল। শরীরটা মোচড়াল রানা, লাথিটা গ্রহণ করল নিতম্বে। পিছনে দাঁড়ানো নাবিকের হাঁটুর নীচে জুতোর কিনারা দিয়ে বাড়ি মারতে ওর হাত দুটো ছেড়ে দিল সে।

নীল জাম্পার চোখে সর্ষে ফুল দেখছে, ফলে বুকে এসে পড়া বিদ্যুৎগতি ঘুসিগুলো শুধু অনুভব করছে সে, দেখতে পাচ্ছে না।

রানা তাকে দু'হাত দিয়ে ধরে ঘোরাল, তারপর তুলে আছড়ানোর ভঙ্গিতে দেয়ালে বাড়ি মারল। ব্যথায়, এবং মৃত্যুভয়ে, ফোঁপাতে শুরু করেছে ছোকরা।

কনুই চালিয়ে পিছনের নাবিকটার পাঁজর ভাঙল রানা। বাকি দু'জন ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, যে যার হাত শরীরের পাশে ঝুলিয়ে রেখেছে।

নীল জাম্পারকে একটা লাথি কষে লাফ দিয়ে দরজার কাছে পৌঁছাল রানা, তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে হারিয়ে গেল অন্ধকার হারবারের আশপাশে।

এক জেটি থেকে আরেক জেটিতে ঢুঁ মারছে রানা। সব

জায়গায় একই দৃশ্য—মাছ ধরবার নৌকাগুলো ডিঙ্গি আর কেবিন ক্রুজারের গায়ে ঘষা খাচ্ছে।

অবশেষে যা খুঁজছিল পেয়েছে বলে মনে হলো। প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা ওটা। কেবিনের যে আকার, চারজন শুতে পারবে। পিছন দিকে দুটো ডিপ-সি চেয়ার দেখা যাচ্ছে। মাস্তুলে উড়ছে চার্টার বোট ফ্ল্যাগ। পিছন দিকে বড় বড় হরফে লেখা: সি হর্স—মাইকোনোস।

'অ্যাহয়, সি হর্স, বোটে কেউ আছে নাকি হে?'

'থাকতে পারে,' ঘরঘরে একটা কণ্ঠস্বর, প্রায় অন্ধকার কেবিনের কোথাও থেকে ভেসে এল।

'তোমার বোট চার্টার করতে চাই।'

'সব বুক হয়ে গেছে।'

'আমি নগদে ভাড়া মেটাব—দ্বিগুণেও রাজি।'

'উঠে এসো।'

ডেকে পা রাখল রানা। হ্যাচ থেকে বেরিয়ে আসা আলোর আভা লক্ষ্য করে এগোচ্ছে। একবারও না থেমে মই বেয়ে সরাসরি কেবিনে নেমে এল।

'নগদ?' নিশ্চিত হতে চাইল গ্রিক নাবিক। তার কাপড়চোপড় প্রায় রানার মতই, তবে অনেক বেশি লম্বা-চওড়া সে। লোকটা বুড়ো, চুল-দাড়ি সব পেকে সাদা হয়ে গেছে। মুখের পাইপ থেকে ভক্-ভক্ ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

'এখন অর্ধেক, বাকি অর্ধেক মাইলোসে পৌঁছে।'

'লং জার্নি।'

'ভোরের ঠিক আগে রওনা হতে চাই আমি।'

'কবে?'

'কাল।'

'ঠিক আছে, আমাকে বুক করো।'

রানার ডানদিকে, বাল্কহেডে, একটা ছোট সাইন দেখা যাচ্ছে,

তাতে বোটের রেট লেখা। সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। রেট অনুসারে পুরো টাকা সাবধানে গুণল, তারপর টেবিলের উপর রাখল। লোকটা হাসল না, চোখের পাতা ফেলল না, মাথা ঝাঁকাল না, এমনকী টাকাটাও তুলল না।

'এই একই অঙ্কের টাকা মাইলোসে পৌঁছাবার পর পাবে।'

এতক্ষণে লোকটা মুখ তুলল, তার গাঢ় চোখে তীব্র দৃষ্টি। 'হারবার মাস্টারের জন্যে একটা ট্রিপ রিপোর্ট ফাইল করতে হবে আমাকে।'

তার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ ধরতে পেরে হাসল রানা, এবং এই প্রথম গ্রিক নাবিকের মুখেও সরু এক চিলতে হাসির রেখা ফুটল।

টেবিলে আরও কিছু টাকা ফেলে হ্যাচের দিকে এগোল রানা। 'করো ফাইল, গন্তব্যের জায়গায় লিখবে–রোডস।'

জেটি থেকে রাস্তায় উঠে এল রানা, ঘুর পথ ধরে হোটেলে ফিরছে। হারামা স্ট্রিটকে সযত্নে দূরে রাখল ও।

ওয়াচডগ দু'জন এখনও নজর রাখছে–একজন মোড়ের কাফেতে বসে কফি খাচ্ছে, আরেকজন হোটেলের দোরগোড়ায় ঘুরঘুর করছে।

লোকগুলো ঘুমায় কিনা কে জানে, ভাবল রানা। একটু ঘুরে হোটেলের পিছন দিকে চলে এল ও, কিচেন হয়ে ভিতরে ঢুকল। দরজার ঠিক ভিতরেই খালি পড়ে রয়েছে দেখে কাঠের একটা বাক্স তুলে নিল ও। গন্ধটা নিঃসন্দেহে মাছের, তলায় এখনও কিছু বরফের টুকরো পড়ে আছে।

'কে তুমি? কী চাও?' বিরাট পালোয়ান, পেটের চারদিকে সাদা একটা অ্যাপ্রন জড়ানো।

'লেট ডেলিভারি।' বাক্সটা এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে নিয়ে বিড়বিড় করল রানা।

'হলের শেষ মাথায় ফ্রিজার।'

'ধন্যবাদ।' হেঁটে এসে বড়সড় ফ্রিজারের পাশে বাক্সটা নামিয়ে রাখল রানা, খোলা একটা দরজা দেখে ভিতরে ঢুকল, হনহন করে সার্ভিস এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে।

দু'মিনিটের মধ্যে নিজের রুমে ঢুকল রানা। ঢুকেই স্থির হয়ে গেল। বিছানায় কেউ বা কিছু একটা নড়ছে। পেশিতে টান ধরছে, এই সময় পরিচিত সেন্টের গন্ধটা নাকে ঢুকল। 'লিয়া?'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার আওয়াজ হলো, সেই সঙ্গে জ্বলে উঠল বেডসাইড ল্যাম্প। হাতলে মুক্তো বসানো একটা .25 দেখা গেল লিয়ার ডান হাতে।

'এদিকের খবর কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভাল,' বলল লিয়া, বেডসাইড টেবিলের উপর অস্ত্রটা রেখে দিল। 'তোমার কথাই ঠিক। ওরা অ্যামেচার।'

'আমাদের বন্ধু কোথায়?'

'আমার কামরায়, বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। সন্ধের অর্ধেকটা জুড়ে আমরা শুধু প্লেট ভেঙেছি, মদ খেয়েছি আর নেচেছি।'

'তারপর?'

'তারপর জিসকা যখন বুঝে ফেলল যে তার সঙ্গে আমি শুচ্ছি না, সব বাদ দিয়ে শুধু ঢক ঢক করে মদ গিলেছে।' একটা গড়ান দিয়ে বিছানা থেকে নামল লিয়া, ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল। 'গড! ব্যথায় পা দুটো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে!'

'সবই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে।' খুক করে একটু হেসে নিজের ব্যাগটার দিকে এগোল রানা।

'সুসিনা?'

'ও সামি কাদরির মেয়ে শায়লা কাদরি। আমি অন্তত নব্বুই পার্সেন্ট নিশ্চিত। ফিল্ম ডেভলপ করার পর বাকি দশ পার্সেন্ট সম্পর্কে জানা যাবে।'

ব্যাগ থেকে কেমিক্যালের একটা কিট, স্লাইড হোল্ডারস্ আর স্বয়ংসম্পূর্ণ ডার্করুম লাইট বের করল রানা। বাথরুমে ঢুকে

আলোটা ঝোলাল, তারপর সিঙ্ক আর টাবে কেমিক্যাল মেশাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পিছন থেকে ওর প্রায় ঘাড়ে এসে পড়ল লিয়া। 'আমি কোনও কাজে লাগতে পারি?'

'না।'

লিয়ার মধ্যে চলে যাওয়ার কোন লক্ষণ নেই, রানাও তাকে যেতে বলছে না।

ফিল্মের দুটো রোল ব্যবহার করেছে রানা। একটা ওর কোন কাজে আসবে না, তবু সেটাও ডেভলপ করছে।

ক্যামেরাটার ডিজাইন করেছে বিসিআই-এর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিকাল ডিপার্টমেন্টের এক্সপার্টরা। এটায় আলট্রা হাইস্পিড ফিল্ম ব্যবহার করা যায়, নিখুঁত ছবি তোলা যায় প্রায়-অন্ধকারেও। ছবি তুলবার সময় কামরায় যে আলো ছিল তা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি তো কম নয়।

ফিল্মগুলো শুকাতে দেওয়ার সময় এ বিষয়ে নিশ্চিত হলো রানা।

'এখন কী?' লিয়ার কণ্ঠস্বরে রুদ্ধশ্বাস প্রত্যাশা, রানাকে স্লাইড হোল্ডার প্রস্তুত করতে দেখছে।

'আমি স্ট্রিপ থেকে কাটছি, একটা-একটা করে নেগেটিভ এই হোল্ডারগুলোয় ভরবে তুমি। এটা বিশেষ ধরনের ফিল্ম, একটা ব্রাউনিশ টোন আসবে। স্লাইড ফিল্মই, তবে নেগেটিভ থেকেও ব্লো-আপ পাওয়া যাবে সহজেই।'

আরও আধ ঘণ্টা কাজ করল ওরা। তারপর বেডরুমে ঢুকে ব্যাগ থেকে আরেকটা কী যেন নিয়ে এল রানা।

'কী ওটা?'

'ডার্ক বক্স, হোল্ডার আর লেন্স। কমার্শিয়াল স্লাইড প্রজেক্টরের মত উন্নত নয়, তবে এতেও কাজ চলে। আলো নেভাও।'

আলো নিভিয়ে আবার রানার কাঁধের পিছনে সরে গেল লিয়া।

প্রথম রোল-এর কয়েকটা ছবি স্লাইডে ফ্ল্যাশ হতেই তার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হলো। 'কারা ওরা?'

'যৌনকর্মী,' জবাব দিল রানা, তারপর রোলের বাকি ছবি তাড়াতাড়ি দেখানো শেষ করল।

দ্বিতীয় রোলের প্রথম ছবিটায় দেখা গেল মাথায় একরাশ কালো চুল নিয়ে এক মেয়ে কাপড় ছাড়ছে—শরীর থেকে খসে পড়ছে স্কার্ট আর ব্লাউজ। মেয়েটার মুখ পুরোপুরি ক্যামেরার দিকে ফেরানো।

রানার পাশে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল লিয়া। 'এই মেয়েটাই!'

'তুমি কী করে জানলে?'

'আমি...আরে, কী আশ্চর্য, বারিক আমাকে তার চেহারার বর্ণনা দেয়নি নাকি!'

আপাতত ব্যাখ্যাটা মেনে নিল রানা। স্লাইডের ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখছে ও। এক সময় স্লাইডে সুসিনার পিঠ আর উল্কির একটা ক্লোজ-আপ দেখা গেল। সিধে হয়ে দেয়ালের কাছে চলে এল ও। ছবিটার প্রতিটি বৈশিষ্ট্য সাবধানে লক্ষ করছে।

মেয়েটার ডান শোল্ডার ব্লেডের ঠিক মাঝখানে প্রজাপতিটা; ডানা মেলে উড়বার ভঙ্গি। বারবার পরীক্ষা করেও কোন সাংকেতিক চিহ্ন খুঁজে পেল না রানা, তবে জানে যে বিসিআই বা রানা এজেন্সির এক্সপার্টরা নিশ্চয়ই পাবে।

'ওটা উল্কি।'

'তা আর বলতে।' একটু হাসল রানা, জিনিস-পত্র সব গুছিয়ে রাখছে। 'এই প্রজাপতির উল্কি দেখেই আমি জেনেছি যে সুসিনা এক সময় ছিল শায়লা কাদরি।'

এর বেশি আর রানা ব্যাখ্যা করল না। লিয়ার চোখ দুটো যেভাবে জ্বলছে, ও জানে বাকিটা সে নিজেই বুঝে নিতে পারবে।

'ওই উল্কিই সাইফার!'

'রাইট।' একটা স্লাইড ব্যাগের গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখল রানা। বাকি নেগেটিভ একটা প্যাড লাগানো মেইলিং ব্যাগে ভরে ফেলল।

'আমরা তা হলে এবার ফিরতে পারি,' বলল লিয়া। 'মেয়েটাকে আর আমাদের দরকার নেই। ফিল্মে সাইফার তো পেয়েই গেছি।'

'তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। দুটি কারণ। এক, উল্কিটা আগের চেয়ে বড় হয়ে গেছে। তখন মাত্র কৈশোর পেরিয়েছিল, সাড়ে তিন বছরে গায়ে-গতরে বেড়েছে মেয়েটা। আমাদের এক্সপার্টরা সাইফার ভাঙার জন্য আসল জিনিসটা দেখতে চাইতে পারে।'

'আর দ্বিতীয় কারণ?'

'শাইখ। যতই ক্রিমিনাল হোক, মানুষ হিসেবে আসলে সে খারাপ নয়। মারা যাচ্ছে, এরকম এক ভদ্রলোককে কথা দিয়েছে তাঁর মেয়েকে সে দেখে-শুনে রাখবে। সেই প্রতিশ্রুতি শাইখ রক্ষা করতে চায়।'

'এরকম কোন কথা আমাকে তো শাইখ ভাই বলেনি...'

দরজার দিকে পা বাড়িয়ে হাসল রানা, হাতে প্যাকেজ। 'তোমাকে আরও অনেক কিছুই বলেনি, লিয়া—মনে পড়ে? অপেক্ষা করো, এখনই আসছি আমি।'

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল রানা। লবিতে একটাই পে ফোন, ফলে লাইন দিতে হলো। রানা এজেন্সির অ্যাথেন্স শাখা আগে থেকেই সতর্ক আর প্রস্তুত হয়ে আছে। ওদের একমাত্র উদ্বেগ গ্রিক পোস্টাল সার্ভিসকে নিয়ে। সায় দিল রানা। এর চেয়ে ভাল উপায় আছে।

নাইট ক্লার্কের মাথায় এলোমেলো সাদা চুল। নাকটা থ্যাবড়া। চিবুক বলতে কিছুই নেই। বেগুনি একটা শার্ট গায়ে, ঠিকমত ইস্ত্রি করা হয়নি। ট্রাউজারটা অসম্ভব পুরানো। শার্টটা গলার কাছে

খোলা, যেন বড়সড় কণ্ঠার হাড়টাকে ওঠা-নামার জায়গা দেওয়ার জন্যই।

'আপনাদের এখানে সেফ আছে?'

লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে ছোট আকৃতির প্রাচীন একটা কালো বাক্স দেখাল রানাকে। ডায়ালে মরচে ধরেছে। হাতলটা পিতলের।

পছন্দ না হলেও, এটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে, ভাবল রানা। 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যাকেজ। আমি আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। কাল সকালে এক লোক এসে নিজের পরিচয় দেবে—গ্রিক অ্যান্টিক শপ-এর ম্যানেজার। এই প্যাকেজ তার হাতে তুলে দেবেন আপনি।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা, হাত বাড়িয়ে পার্সেল নেওয়ার সময় চোখ দুটো ঢুলু-ঢুলু হয়ে থাকল।

'এবার বলুন তো দেখি, প্যাকেজটা আপনি কাকে দেবেন!' চাপা গলায় হুংকার ছাড়ল রানা।

বিড়বিড় করে নির্ভুল জবাবই আউড়াল ক্লার্ক। সেফ খুলে প্যাকেজটা ভিতরে রাখল সে। তারপর যেই সেফের দিকে পিছন ফিরেছে, অমনি তার শার্টের সামনেটা হাতের মুঠোয় নিয়ে হ্যাঁচকা টান দিল রানা। লোকটাকে প্রায় কাউন্টারে তুলে আনল ও।

'ওই লোকটা প্রকাণ্ড। ভয়ানক হিংস্র। প্যাকেজটা যদি ভাল অবস্থায় না পায়, তোমার দুই হাত আর দুই পা সে রাখবে না। বুঝতে পারছ কথাটা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পারছি,' চিঁচিঁ করে বলল ক্লার্ক।

'ভেরি গুড।' লোকটাকে চেয়ারে নামাল রানা, তারপর শার্টের পকেটে এক মুঠো কড়কড়ে নোট গুঁজে দিল। 'ভাল একজোড়া শার্ট কিনো।'

সামনের জানালাটা চেক করল রানা। ওয়াচডগদের একজন সম্ভবত হোটেলের পিছন দিকটায় চোখ রাখতে গেছে। অনেক দেরি করে ফেলেছে, ভাবল ও অপর লোকটা এখনও

দোরগোড়ায় পাহারা দিচ্ছে।

কামরায় ফিরে কাপড়চোপড় খুলে শুয়ে পড়ল রানা। বন্ধ বাথরুমে আলো জ্বলতে দেখল ও। এক মিনিট পর খুলে গেল দরজাটা। আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে লিয়া, পাতলা নাইটির ভিতর তার শরীরের উত্তেজক রেখাগুলো স্পষ্ট।

'এখন কী করব আমরা?' জানতে চাইল সে।

'মেয়েটাকে সরিয়ে আনব,' বলল রানা।

আলো নিভিয়ে বিছানার দিকে হেঁটে এল লিয়া। রানা উপুড় হয়ে শুচ্ছে, এই সময় ক্রল করে ওর পাশে চলে এল মেয়েটা। নরম শরীর দিয়ে ঢেকে ফেলছে ওকে। 'কখন?' রানার পিঠে একটা হাত রেখে জানতে চাইল।

'আজ সকালে, ভোর চারটের দিকে–কাজেই দু'জনেরই ঘুমানো দরকার।' গড়িয়ে একটু দূরে সরে গেল রানা।

এক কি দু'মিনিট চুপ করে থাকল লিয়া। তারপর কুণ্ডলী পাকাল শরীরটা, একটা হাত তুলে দিল রানার গলায়। 'ওকে আমরা কোথায় নিয়ে যাব?'

উত্তর দেওয়ার আগে কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা। 'রোডস আইল্যান্ডে। ওখানে আমাদের একটা সেফ হাউস আছে। এবার ঘুমাও।'

প্রায় এক ঘণ্টা পর রানা অনুভব করল বিছানা থেকে সাবধানে নেমে যাচ্ছে লিয়া। পাতলা নাইটির উপর, গায়ে একটা রোব জড়াল সে। নিঃশ্বাস পতনের ছন্দটা অটুট রাখল রানা। একটু পর পা টিপে টিপে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল লিয়া।

পনেরো মিনিট পর ফিরে এল সে। অত্যন্ত সাবধানে, এতটুকু শব্দ না করে বিছানায় শুলো আবার।

অন্ধকারে নিঃশব্দে হাসল রানা।

কাল বিকেলে যখন মাইলোসে ভিড়বে ওরা, অবাক হয়ে যাবে লিয়া।

আট

চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে হাতঘড়ির উপর চোখ বুলাল রানা, এবার নিয়ে গত পাঁচ মিনিটে তিনবার।

কাঁটায় কাঁটায় চারটে বাজে। বারো নম্বর হারামা স্ট্রিটের ব্যবসা নিশ্চয়ই আজ রাতের মত শেষ হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে মেয়েগুলো সম্ভবত যে যার বিছানায় শুয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছে।

দরজার কাছে একটা চেয়ারে বসে সিগারেটে টান দিচ্ছে লিয়া আর চোখ থেকে ঘুম তাড়াবার চেষ্টা করছে।

'ঠিক জানো ব্যাগগুলো একা সামলাতে পারবে?'

'পারব, চিন্তা কোরো না। তোমার কোন সাহায্য লাগবে কি না সেটা বলো।' রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে লিয়া।

'সাহায্য লাগবে বুঝলে কাজটায় আমি হাতই দেব না, ফিরে এসে তোমাকে নিয়ে যাব। কী যেন নাম বোটটার?'

'সি হর্স।'

'কত নম্বর জেটি?' জানতে চাইল রানা।

'চার।'

'পাস। আমার এক ঘণ্টা পর বেরুবে তুমি।' বেডরুমে চলে এল রানা। একটা অফ হোয়াইট শার্ট, একজোড়া তামাটে রঙের স্ল্যাকস্ আর একটা লাইটওয়েট জ্যাকেট পরল। ডান পায়ের গোড়ালির কাছে স্থান পেল প্রিয় ওয়ালথার, স্ট্র্যাপে জড়ানো। ব্যাগ থেকে সবশেষে বেরুল সানগ্লাস আর একটা সিল্ক টাই।

সানগ্লাস চোখে উঠল। টাইটা ঠাঁই পেল জ্যাকেটের সাইড পকেটে।

'আমাদের বন্ধুকে নিয়ে কী করা হবে?'

'জিসকাকে নিয়ে? তাকে ঘুমাতে দাও। কামরাটা তো বিকেল পর্যন্ত ভাড়া করা আছেই।'

শেষ একবার আয়নায় নিজেকে চেক করে নিল রানা। সন্তুষ্ট, ওর এখনকার চেহারার সঙ্গে কাল সন্ধ্যার মেক্সিকান নাবিকের চেহারার সামান্যতম মিলও কেউ খুঁজে পাবে না।

'রানা?'

'ইয়েস?'

'তুমি সি হর্সে না ফিরলে কী হবে?'

'ধরে নেবে হয় আমি তোমাকে ডাবল-ক্রস করেছি, নয়তো মারা গেছি।'

রাগে ফুলছে লিয়া, তাকে রেখে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রানা।

এক নম্বর ফেউকে রাস্তার ওপারে, কাফের জানালায় দেখা গেল, টেবিলের উপর ঝুঁকে আছে, কফির কাপে চুমুক দিয়ে চেষ্টা করছে জেগে থাকবার।

হাঁটায় এতটুকু বিরতি না দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল রানা, পার হলো সেটা, কাফেটাকে ডান পাশে রেখে এগোল। কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে তাকাবার কোন প্রয়োজন বোধ করছে না ও জানে ছোটখাট ফেউটা ঠিকই পিছু নেবে।

নীলচে স্ট্রিট লাইটগুলো মনে হচ্ছে জ্বলছে মনে মনে। কোন রকমে শুধু ওদের সরাসরি নীচটা আলোকিত করতে পারছে। বিদ্যুতের খরচ কমানোর জন্য বন্ধ দোকানগুলোতেও আলো খুব একটা জ্বালা হয়নি। অল্প কিছু নিওন সাইনের আলোয় শুধু ঘড়ির ডায়াল পড়া যাচ্ছে, তার বেশি কিছু নয়।

এক এক করে দুটো ব্লক পার হয়ে এল রানা। বাঁক নিয়ে ছোট একটা স্ট্রিটে ঢুকবার সময় শিস দিল। এই রাস্তাটার শেষ

মাথায় পৌঁছে হাঁটবার গতি একটু কমিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল পিছনে ফেউটা লেগে আছে কিনা, তারপর আবার ডানদিকে বাঁক নিল।

এটা একটা সরু গলি, পাশাপাশি তিনটে মানুষ কোনরকমে দাঁড়াতে পারবে। ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। গলিটা আবাসিক এলাকার ভিতর পড়েছে। তিনটে বাড়িকে পাশ কাটিয়ে আসবার পর ওর পছন্দের দোরগোড়াটা পাওয়া গেল। স্যাৎ করে ভিতর দিকে সরে এল রানা।

টাইটা জ্যাকেটের পকেট থেকে বেরিয়ে এল। প্রান্ত দুটো দু'হাতে জড়াচ্ছে।

বাঁকের কাছে এসে দ্রুত হলো পায়ের আওয়াজ। রানাকে হারিয়ে ফেলবার ভয়ে এতই উদ্বিগ্ন যে ডানে-বাঁয়ে কোনদিকেই তাকাচ্ছে না লোকটা।

নিঃশব্দে তার পিছনে বেরিয়ে এল রানা, টাইটা দিয়ে লুপ তৈরি করে পরিয়ে দিল গলায়। টেনে তাকে গাঢ অন্ধকারে নিয়ে এল ও। 'আলাপ-সালাপ হোক। তোমার বন্ধু কোথায়?'

ধস্তাধস্তি শুরু করেছে লোকটা। কনুই দিয়ে রানার পাঁজরে গুঁতো মারতে চাইছে। জুতোর কিনারা দিয়ে মারতে চাইছে হাঁটুর নীচের শক্ত হাড়ে।

লোকটার বীরত্ব দেখাবার শখ অবশ্য একটু পরই মিটে গেল। তার শিরদাঁড়ার নীচের প্রান্তে ভাঁজ করা একটা হাঁটু রেখে নিজের হাত দুটো মোচড়াল রানা। টাইয়ের প্যাঁচ কণ্ঠনালীতে চেপে বসতে তার ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ ফোঁস-ফোঁস হয়ে উঠল। তাও নিস্তেজ হয়ে আসছে।

'আর ত্রিশ সেকেন্ড পর মারা যাবে তুমি।

লড়াই এখন শুধু লোকটার হাত দুটোর সঙ্গে, গলা থেকে খুলবার জন্য টাই ধরে প্রাণপণ টানাহ্যাঁচড়া করছে।

'সামান্য একটু ঢিল করছি, একটু যাতে ফিসফাস করতে পারো। জবাব না দিলে মৃত্যু। কে তোমাকে ভাড়া করেছে?'

ফুসফুসে নতুন বাতাস পেয়ে কথা বলবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল লোকটা। 'অ্যাথেন্সে··· লোকটার নাম ময়নিহান। দু'ঘণ্টা পর পর ফোন করে তাকে জানাতে হয় আপনি আর আপনার বান্ধবী কী করছেন··· কোথায় যাচ্ছেন···'

'অ্যাথেন্সের নম্বরটা বলো।'

পকেট হাতড়ে এক টুকরো কাগজ বের করল লোকটা, তারপর নিজের কানের পাশে তুলল। দাঁত দিয়ে ধরল ওটা রানা, কথা বলল দাঁত বন্ধ রেখেই। 'তোমার সঙ্গী কোথায়?'

'ফোন করতে গেছে।'

'কোথায়?'

'আপনার হোটেলের পিছনে, একটা কাফেতে।'

'এই ময়নিহান··· লোকটা কি ইজরায়েলি?'

'বোধহয়···হতে পারে।'

'তোমরা দু'জন আর কী করো, আমার মত ভদ্রলোককে অনুসরণ করা ছাড়া?'

লোকটার ডান হাতের নড়াচড়া অনুভব করতে পারল রানা। শরীরের কোথাও লুকানো ছিল, ছুরিটা তার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। ওর ডান কাঁধের উপর দিয়ে চোখে উঠে আসছে ফলার ডগা।

আধ ইঞ্চি তফাত দিয়ে পার হলো ফলা, তবে কানে একটু খোঁচা লাগল। 'ব্লাডি ফুল!' দাঁতে দাঁত পিষল রানা। খেপে গিয়ে লোকটার নিতম্বে হাঁটু গাড়ল, একই সঙ্গে টাইটা উপর দিকে তুলে হাত দুটো যতটা পারা যায় মোচড়াল।

নীরবতার ভিতর আওয়াজটা ভয়ানক জোরাল লাগল কানে, যেন মোটা একটা পেনসিল ভেঙে গেল।

টাইটা গলা থেকে খুলে নিয়ে লাশটাকে দরজার গায়ে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রাখল রানা। পিছনের সরু একটা গলি দিয়ে হোটেলে ফিরবার সময় কাগজের টুকরোটায় লেখা ফোন নম্বরটা

মুখস্থ করে নিল।

দু'নম্বর ফেউ এই মাত্র রিপোর্ট করেছে। অর্থাৎ যে-ই ওদেরকে ভাড়া করে থাকুক, আগামী দু'ঘণ্টা আরেকটা ফোন কল সে আশা করছে না। ভাগ্য সহায়তা করলে এটা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময়, অবশ্য যদি না এই দু'জনের অগোচরে মাইকোনোসের কোথাও একটা ব্যাকআপ থাকে।

রানার ধারণা, আছে।

জানালার ঝাপসা কাঁচের ভিতর দিয়ে দু'নম্বর ফেউটাকে কাফেতে বসে থাকতে দেখল রানা। এ বেশ লম্বা-চওড়া, সঙ্গীর চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক বলেও মনে হলো।

ওর হোটেলের পিছনের দরজা থেকে অল্প একটু দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে রানা, চিন্তা করছে নিজের চেহারা না দেখিয়ে কীভাবে লোকটাকে কাফে থেকে বের করা যায়।

কেন জানে না, তবে ইন্সটিঙ্কট বলছে এই লোককে সামলানো সহজ হবে না।

ভাগ্য সহায়তা করল। কাফের মালিক, প্রকাণ্ড হাতি বললেই হয়, দোকান বন্ধ করে দিচ্ছে। দু'নম্বর ফেউ একমাত্র খদ্দের। কাফে মালিকের হাত নাড়া দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল, তাকে চলে যেতে বলা হচ্ছে।

দু'মিনিট পর কাফে থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। হোটেলের পিছনের দরজাটা একবার চেক করল সে, তারপর রাস্তার উপর চোখ বুলিয়ে ঠিক করল কোথায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে।

তার হাঁটবার গতি আর দিক নির্ণয়, এই দুটো জিনিস লক্ষ করে রানা অনুমান করল লোকটা ওর ঠিক উল্টো দিকের একটা দোরগোড়ায় এসে থামবে।

রাস্তাটা সরু। দু'হাতে আবার টাইটা জড়াল রানা। দূরত্বটা আন্দাজ করল। তারপর অপেক্ষা। যেই মাত্র লোকটা দোরগোড়ায় পৌঁছে ঘুরতে যাবে, কমবেশি দশ ফুট দূরত্ব দুই লাফে পেরিয়ে

এল ও।

পাথুরে রাস্তায় রানার জুতোর ঘষা খাওয়ায় সতর্ক হতে শুরু করেছিল লোকটা, তবে রানা তাকে কিছু করবার সময়ই দিল না।

সব ভুলে পাগলের মত গলা আর টাইয়ের মাঝখানে হাত ঢুকাতে চেষ্টা করছে লোকটা, তাতে তার পিঠ ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল। রানার অভ্যস্ত হাঁটু গুঁতো মারল নিতম্বের ঠিক উপরে।

গুড়িয়ে উঠে পাথরের মেঝেতে পড়ে গেল লোকটা। হাঁটুটা তার পিঠে তুলে এনে চাপ দিল রানা, তারপর সামান্য ঢিল দিল টাইয়ে। 'তোমার সঙ্গী মারা গেছে। কথা বলো, তা না হলে তোমাকেও মরতে হবে।'

একেও একের পর এক সেই একই প্রশ্ন করে গেল রানা। উত্তরগুলো মিলে গেল। তারপর প্রসঙ্গ বদল করল ও। 'টেলিফোন করে কী বলল সুন্দরী?'

'কে সুন্দরী? কী ফোন?'

'আমার সঙ্গিনীর কথা বলছি। আজ মাঝরাতের দিকে তোমাকে ফোন করেছে সে।'

'না! ঈশ্বরের দিব্যি, না! সে কীভাবে ফোন করবে?'

বিস্ময়টা নির্ভেজাল মনে হলো, ফলে লোকটার কথা বিশ্বাস করল রানা; অর্থাৎ রহস্যটার কোন কিনারা হলো না। গভীর রাতে কামরা ছেড়ে কাকে ফোন করতে গিয়েছিল লিয়া?

'ওঠো!' গলা থেকে টাইটা খুলে নিল রানা।

লোকটা হাত আর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে শরীরটাকে উঁচু করছে, এই সময় তার ডান কানের পিছনে হাতের কিনারা দিয়ে পরপর দুটো কোপ মারল ও।

আবার মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা, এবার জ্ঞান হারিয়েছে।

পাঁচ মিনিট পর দু'নম্বর ফেউকে বড় একটা ডাস্টবিনে ফেলে দিল রানা। তারপর দ্রুত, মাপা পদক্ষেপে এগোল হারামা স্ট্রিটের দিকে।

*

বুজুকি বার এখনও চুটিয়ে ব্যবসা করছে। সেই একেবারে ভোর পর্যন্ত খোলা রাখে ওরা।

ভিড় ঠেলে ক্লাবের একেবারে পিছনে চলে এল রানা, দেয়াল ঘেঁষে ফেলা একটা টেবিল নিয়ে বসল। হয় নেশায়, না হয় ঘুমে ঢুলু ঢুলু হয়ে আছে সবার চোখ, কেউ ওর দিকে ভাল করে তাকাল না। বার কয়েক চেষ্টা করবার পর ক্লান্ত ওয়েট্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল ও।

চেহারায় বিরক্তি নিয়ে এগিয়ে এল সে। 'কী চাই আপনার?'

'রেটসিনা। দু'গ্লাস। আমার এক বন্ধু আসছে।'

ধীর পায়ে ফিরে গেল ওয়েট্রেস। চারদিকটা ভাল করে দেখে নিচ্ছে রানা। টয়লেটগুলো নীচে—কয়েকটা ধাপ বেয়ে নামতে হবে, সেদিকে আলো বলতে একটা মাত্র হলুদ বালব। ওখানে আরেকটা দরজা দেখা যাচ্ছে, গায়ে লেখা 'প্রাইভেট'। রানা ধারণা করল, ওটাই ওর দরকার।

দু'গ্লাস রেটসিনা নিয়ে এল ওয়েট্রেস মেয়েটা, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে। 'দু'হাজার ড্রাকমা।'

বিল মেটাবার পর এক হাজার ড্রাকমার একটা নোট আঙুলে ঝুলিয়ে রাখল রানা। 'আমি একটা ফোন করতে চাই।'

'সামনের দিকে চলে যান, দরজার পাশে।'

'দূর। ভীষণ হইচই। আমার এটা একটা প্রাইভেট কল।' নোটটা টেবিলে ফেলল রানা, তারপর সেটার পাশে সমমানের আরেকটা নোট রাখল।

ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে বারটেন্ডারকে দেখে নিল মেয়েটা। বারের সামনের অংশে রয়েছে লোকটা, নিয়মিত খদ্দেরদের সঙ্গে কী নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে।

'এদিক দিয়ে,' বিড়বিড় করল ওয়েট্রেস, দুটো নোটই অ্যাপ্রনের পকেটে লুকিয়ে ফেলেছে।

মুখে গন্ধ থাকা দরকার–একটা গ্লাস তুলে চুমুক দিল রানা, কাঁধের উপর কাপড়েও কিছুটা ছিটাল। তারপর পিছু নিল মেয়েটার।

প্রাইভেট লেখা দরজার ভিতর দিয়ে ছোট একটা হলওয়েতে বেরিয়ে এল ওরা। এখানে আলো খুব কম। আরও দুটো দরজা দেখল রানা, একটা খোলা, অপরটা বন্ধ।

খোলা দরজার ভিতর ছোট্ট একটা অফিস দেখা যাচ্ছে। একটা চেয়ার, একজোড়া ফাইল কেবিনেট আর একটা ডেস্ক নিয়ে অফিসটা। ডেস্কে একগাদা কাগজ-পত্র।

'টেলিফোনটা ডেস্কে।'

'আমার একটু সময় লাগতে পারে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিছু হটল মেয়েটা, ক্লাবে বেরিয়ে গিয়ে প্রাইভেট লেখা দরজাটা বন্ধ করে দিল।

হলের বন্ধ দরজাটা চেক করল রানা। তালা দেওয়া। ওর অবশ্য খুলতে দশ সেকেন্ডের বেশি লাগল না।

ঠিক যেমনটি আন্দাজ করেছিল–দরজার ভিতর এটা হোটেল আর ক্লাব, দুই প্রতিষ্ঠানেরই অংশ: একটা স্টোররুম। বেশির ভাগ সম্ভাবনা মাদাম গ্লোরিয়া দুটো দালানেরই মালিক।

স্টোররুমে উল্টোদিকের দেয়ালে আরেকটা দরজা রয়েছে। সেটায় তালা দেওয়া নেই, হাতের চাপ দিতেই খুলে গেল। সামনে এক প্রস্থ সিঁড়ি দেখল রানা, আজ রাতের প্রথম প্রহরে এই সিঁড়িটাই দেখেছিল ও উপর থেকে।

শেড লাগানো একটা পেনসিল টর্চ জ্বেলে ধাপ বেয়ে উপরে উঠছে রানা।

এখন থেকে খেলাটা অনুমানের উপর নির্ভর করে খেলতে হবে। বিষাক্ত টিউমার আর বক্সার ওয়েটার তথা মাসলম্যান সম্ভবত মেইন ফ্লোরে থাকে। বাকি ফ্লোরগুলোয় থাকে মেয়েরা। প্রতিটি ফ্লোরে পাঁচটা করে কামরা।

তিন আর চারতলার দরজাগুলো পাশ কাটিয়ে এল রানা, পাঁচতলায় উঠে তালা খুলল পিক দিয়ে।

হলওয়েতে আগেও যা দেখেছে, এখানেও তাই দেখল, নিঃসঙ্গ একটা নিস্তেজ বালব থেকে হলুদ আলো ছড়াচ্ছে। দুটো দরজার নীচে উজ্জ্বলতা দেখা গেল, দুটোর মধ্যে একটার ভিতর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে। অপরটা থেকে আসছে মিউজিকের শব্দ।

মাথার চুল যতটা সম্ভব এলোমেলো করল রানা, শার্টের প্রান্ত বের করে ঝুলিয়ে রাখল, এক কাঁধ থেকে নামিয়ে ফেলল জ্যাকেটটা।

একটা দরজায় মৃদু টোকা দিল। কেউ সাড়া দেওয়ার আগেই নিজেই খুলে ফেলল সেটা। ভিতরে ঢুকল টলতে টলতে। একটা বদ্ধ মাতাল।

'এই! কী! কে...'

'হাই, দেয়ার...ডার্লিং...'

নগ্ন একটা মেয়ে, ক্লান্ত এবং বিধ্বস্ত, বিছানার কিনারায় বসে টাকা গুণছে।

ধপ করে তার পাশে বসে পড়ল রানা। 'মাফ করবে...ডার্লিং...আমি হারিয়ে গেছি।' মাতালের বাচনভঙ্গি অনুকরণ করছে।

'কী?'

'সারারাত থাকব বলে টাকা দিয়েছি। গেলাম টয়লেটে...তারপর আর মনে করতে পারছি না কোন ঘরে ছিলাম।'

ওর গায়ে আর নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ থাকায় কথাটা বিশ্বাস করল মেয়েটা। ইতিমধ্যে দ্রুত হাতে টাকাগুলো সামলে নিয়েছে সে। একটু সরে বসে বলল, 'মাদাম পিসিলাকে ডাকছি।' কর্ডটা ধরবার জন্য দেয়ালের দিকে হাত বাড়াল।

দ্রুত দেয়াল আর মেয়েটার মাঝখানে চলে এল রানা। 'নাহ্, তার ঘুম ভাঙানো উচিত হবে না। তুমি শুধু কামরাটা আমাকে দেখিয়ে দাও।'

মেয়েটা এক মুহূর্ত ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকাল। 'কার কামরা? তার নাম জানেন?'

'সুসিনা...ওই যে, চুপচাপ থাকে।'

'ও, আচ্ছা। এক ফ্লোর নীচে, দশ নম্বর কামরা।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, ডার্লিং...এই নাও!' পকেট থেকে পাঁচ হাজার ড্রাকমার একটা নোট বের করে তার হাতে গুঁজে দিল রানা।

চোখের সামনে তুলে মেয়েটা প্রথমে দেখল নোটটা কত বড়, তারপর ওর গায়ের কাছে সেঁটে এসে বলল, 'সুসিনা হয়তো তোমার জন্যে যথেষ্ট নয়। তোমার হয়তো দুটো মেয়ে দরকার।'

'এই কথাটা সন্ধ্যার সময় বললে না কেন, ডার্লিং? এখন তো আমি ঘুমাতে যাচ্ছি।' নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে টলতে টলতে দরজার দিকে এগোল রানা।

'তা হলে পরের বার?'

'অবশ্যই।'

দালানটার সামনে আর পিছনে দু'প্রস্থ সিঁড়ি। চারতলায় নামল রানা পিছন দিক দিয়ে। তালা খুলে হলওয়ের হলুদ বালবটা নেভাল, কামরাটা খুঁজে নিল পেনসিল টর্চ জ্বেলে।

ঠেলা দিতে দশ নম্বরের দরজা খুলে গেল। কোন শব্দই হয়নি। সুসিনা বিছানায় শুয়ে আছে। শরীরটা চাদরে ঢাকা, বাইরে ফুটে আছে দৈহিক কাঠামোর নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য।

চেহারাটা দেখে নিয়েই টর্চ নিভিয়ে ফেলল রানা। দরজা বন্ধ করে বোল্ট টেনে দিল। বাইরের দিকের জানালা গলে ভিতরে ঢুকছে আলোর মৃদু আভা। বিছানার পাশে, নিচু টেবিলটার কাছে সরে এল রানা। ইতিমধ্যে অ্যামপুল আর হাইপডারমিক সিরিঞ্জটা পকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে।

সিরিঞ্জে ট্র্যাঙ্কুইলাইজার ভরে নিয়ে তৈরি হলো রানা, খালি হাতটা দিয়ে সুসিনার কাঁধে মৃদু ধাক্কা দিল।

কাত হয়ে ছিল, সঙ্গে সঙ্গে চিৎ হলো মেয়েটা, চোখ মেলে তাকাল। একটু চমকে গেছে, অপলক তাকিয়ে দেখছে রানাকে। চোখে-মুখে এতটুকু ভয় নেই, এমন কী এই প্রশ্নও নেই যে এরকম অসময়ে তার ঘরে কী করছে ও।

রক্ত মাংসের একটা রোবট মেয়েটা। যে যা বলে তাই শোনে। একাধারে রাগ আর দুঃখ হচ্ছে রানার। ফুলের মত নিষ্পাপ একটা তরুণীকে প্রাণধারণের জন্য কী রোমহর্ষক কী নারকীয় সব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সাড়ে তিনটে বছর পার করতে হয়েছে।

সিরিঞ্জটা সুসিনার নগ্ন হাতের মাংসল একটা জায়গায় তাক করল রানা। এই ট্র্যাঙ্কুইলাইজার অল্প একটু ইনজেক্ট করলে মেয়েটার প্রতিরোধ শক্তি বলে কিছু থাকবে না। তবে ঘুম পাড়াতে চাইলে অন্তত অর্ধেকটা পুশ করতে হবে।

সুইটা মাংসে ঢোকাতে গিয়ে থেমে গেল রানা। 'সুসিনা?' মেয়েটার কপালে আঙুলের ডগা বুলাল ও, সরিয়ে দিল চুলের কয়েকটা গোছা।

চোখ মিটমিট করে মাথা ঝাঁকাল সুসিনা।

'মাদামের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমার সঙ্গে তোমাকে খেলার অনুমতি দিয়েছে সে। আমরা একটা বোটে চড়ে বেড়াতে যাব। তুমি খুশি তো?'

আরও কয়েকবার ওঠা-নামা করল চোখের পাতা, ভাবনার জগতে একটা আলোড়ন উঠল, অবশেষে আরেকবার মাথা ঝাঁকাল সুসিনা।

'তোমাকে আর এখানে কষ্ট করতে হবে না। তুমি না চাইলে কেউ আর তোমাকে ছুঁতেও আসবে না। তুমি সুইমিং পুলে সাঁতরাবে, সৈকতে বসে গায়ে রোদ মাখবে, যখন যা করতে ইচ্ছে

হয় তাই করবে–কেউ বারণ করবে না।'

মুখের একটা কোণ তির্যক ভঙ্গিতে একটু উঁচু হলো; এটাই তার হাসি বা হাসির কাছাকাছি একটা মুখভঙ্গি।

ট্র্যাঙ্কুইলাইজার দরকার নেই, বুঝতে পেরে সিরিঞ্জটা জ্যাকেটের পকেটে রেখে দিল রানা। ওয়ার্ড্রোব খুলে জিনসের প্যান্ট, সুতি শার্ট আর একজোড়া জুতো বের করে তাড়াতাড়ি পরে নিতে বলল সুসিনাকে।

বিনা দ্বিধায় ওগুলো পরল মেয়েটা। রানা তার কনুই ধরে দরজার দিকে হাঁটিয়ে আনছে।

হঠাৎ থমকাল সুসিনা। ঝাঁকি দিয়ে কনুইটা ছাড়িয়ে নিল। পিছু হটছে, সেই সঙ্গে এদিক ওদিক নাড়ছে মাথাটা।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে তার দিকে এগোল রানা। ইঞ্জেকশনটা তা হলে দিতেই হবে। জ্যাকেটের পকেটে হাত ভরছে, এই সময় দৃশ্যটা দেখে স্থির হয়ে গেল ও।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে গদি মোড়া টুলটায় বসেছে সুসিনা। ঝুঁকে সুইচ টিপল, আয়নার উপর একটা আলো জ্বলে উঠল। দ্রুত হাতে মেকআপ নিচ্ছে সে।

মেকআপ শেষ হতে চুলে চিরনি চালাল, তারপর আয়নার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে হাসল রানার উদ্দেশে।

উত্তরে রানাও হাসল, তবে সেটা আড়ষ্ট। সন্দেহ নেই, সুসিনার প্রতি নির্দেশ আছে মেকআপ ছাড়া কখনোই ড্রেস পরবে না বা বাইরে কোথাও যাবে না। ব্যবসার স্বার্থে এটা অবশ্য পালনীয়।

শরীরটা মুচড়ে বাঁকা হলো সুসিনা, চোখে প্রত্যাশা নিয়ে সরাসরি রানার দিকে তাকাল। মেয়েটার সারল্য ওর হৃদয়টাকে ছুঁয়ে দিল।

'তুমি রেডি, সুসিনা?' রানার প্রশ্ন শুনে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা. টুল ছেড়ে উঠে এসে এবার নিজেই ওর একটা হাত ধরল। 'কোন

শব্দ না করে নেমে যাব আমরা, কেমন?'

আবার মাথা ঝাঁকাল সুসিনা।

ক্লাবে নেমে এসে নিজের টেবিলে সুসিনাকে নিয়ে বসল রানা। বারটেন্ডার এখনও তার খদ্দেরদের নিয়ে ব্যস্ত। ওয়েট্রেস বারের কাছে একটা টুলে বসে ঝিমাচ্ছে।

টেবিলে কিছু টাকা রেখে সুসিনাকে নিয়ে উঠল রানা। দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, কেউ পিছু নেয়নি।

রাস্তায় বেরিয়ে আসবার পরও রানার বিশ্বাস হতে চাইছে না যে এত সহজে মেয়েটাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। হারবারে পৌঁছে চার নম্বর জেটি খুঁজে নিল ও।

সি হর্স এখনও নিজের ডকে ভাসছে। কাছাকাছি এসে ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন শুনতে পেল রানা।

সি হর্সের বুড়ো মালিক ডেক চেয়ারে বসে পাইপ টানছে। রানাকে দেখে হাসল। 'এই মেয়ে তৃতীয় আরোহী?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমরা এবার রওনা হতে পারি?'

'তুমি রশি খুললেই পারি,' চেয়ার ছেড়ে এরই মধ্যে হুইল ডেকের উদ্দেশে পা বাড়িয়েছে বুড়ো।

সুসিনাকে ডেকে তুলে দিল রানা। বোটের রশি খুলে নিজেও লাফ দিয়ে উঠে পড়ল।

হুইল হাউসের দরজায় এসে হেলান দিয়ে দাঁড়াল ও। 'আমার বন্ধু এসেছে?'

'খুব সুন্দর? মাথার চুল একটু লালচে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'নীচে।'

'ধন্যবাদ।'

মাত্র বাঁক নিয়েছে ওরা, এই সময় হ্যাচ গলে বেরিয়ে এল লিয়া। সুসিনাকে দেখল সে, তারপর ঝট করে রানার দিকে

তাকাল।

'ওকে তা হলে তুমি পেয়েছ।'

'হ্যাঁ।' সুসিনার দিকে ফিরল রানা। 'সুসিনা, এ হলো...'

এইটুকুই শুধু বলতে পারল রানা। ওর মুখে কথা আটকে গেছে।

লিয়ার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রয়েছে সুসিনা। তার সারা শরীরে ভয়ানক কাঁপন ধরে গেছে। কথা বলবার চেষ্টায় ঠোঁট দুটোও কাঁপছে, কিন্তু খুব সামান্য দুর্বোধ্য আওয়াজ ছাড়া তার মুখ থেকে আর কিছু বেরুচ্ছে না।

'সুসিনা, হঠাৎ তোমার কী হলো?' জানতে চাইল রানা, তার কাঁধে হাত রেখে কাঁপুনিটা থামাবার চেষ্টা করছে।

এক পা এগোল সুসিনা, তারপর জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল রানার বাহুতে।

নয়

কাঁধে সামান্য একটু ছোঁয়া লাগতেই ঘুম ভেঙে গেল রানার। চোখ মেলে দেখল ইজিচেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বুড়ো স্কিপার, পাইপটা এখনও তার মুখের চারপাশে ধোঁয়ার মেঘ তৈরি করছে।

'ইয়েস?'

'আমরা আর পঁচিশ মিনিট বা আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছাব। গ্যালিতে তাজা কফি পাবে।'

'ধন্যবাদ।'

স্কিপার চলে যেতে গা থেকে চাদর সরিয়ে আড়মোড়া ভাঙল রানা,, পাশের চেয়ারে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকা লিয়ার দিকে তাকাল। অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে।

সূর্য ইতিমধ্যে অনেকটা উপরে উঠে এসেছে। হ্যাচ গলে গ্যালিতে নেমে কফি খেল রানা, কিছুটা চাঙ্গা হয়ে আরেকটা হ্যাচের ভিতর দিয়ে মেইন কেবিনে গিয়ে দেখল সুসিনাও ঘুমাচ্ছে।

জ্ঞান হারাবার পর রানাই এখানে তাকে শুইয়ে দিয়ে যায়। চাদরের ভাঁজ দেখে বোঝা গেল সেই থেকে নড়েনি মেয়েটা।

'ও অমন করল কেন? ও কি অসুস্থ?' অজ্ঞান সুসিনাকে নিয়ে মেইন কেবিনে নামছিল রানা, ওর পিছু নেয় লিয়া।

'বলা মুশকিল অমন কেন করল। তবে অসুস্থ নয়। হতে পারে তোমাকে আরেকজন মাদাম বলে মনে করেছে, ভেবেছে আগের মাদামের মত তুমিও ওকে কাজে নামাবে।'

এটা রানার মুখের কথা। ও জানে, সুসিনা মেয়েটার মধ্যে ভাবাবেগ বলে কিছু নেই। কোন কিছুই তাকে আলোড়িত করে না। কাজেই তার জগৎকে এলোমেলো করে দিতে হলে অত্যন্ত জোরাল কিছু দরকার।

লিয়া যেভাবেই হোক মেয়েটার মনোজগতে একটা ঝড় তুলেছে। কেন বা কীভাবে, রানা জানে না–এখনও। তবে জানবার কোন চেষ্টাই বাদ রাখবে না ও।

কফি শেষ করে মেয়েটার পালস্ দেখল রানা। স্বাভাবিক। ডেকে ফিরে এল ও। সি হর্স এরই মধ্যে মাইলোসের দক্ষিণ প্রান্ত ঘুরে এসেছে, দ্বীপের পশ্চিম তীর রেখা ধরে উত্তর দিকে যাচ্ছে। ডান দিকে পরিচ্ছন্ন অ্যাপোলোনিয়া সৈকত দেখা যাচ্ছে, আরও সামনে আকাশে মাথা তুলে আছে মাউন্ট প্রোফিটিস ইলিয়াস।

মিনিট দশেক পর ঘুম ভাঙল লিয়ার। 'পৌঁছাতে আর কতক্ষণ লাগবে?'

'মিনিট দশ-বারো। গ্যালিতে কফি পাবে।' তিন মিনিট পর হ্যাচ থেকে বেরিয়ে এল সুসিনা। ডেকে উঠে রেইল ধরে দাঁড়াল সে। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাসল। একটু পরেই গ্যালি থেকে উঠে এল লিয়া।

সুসিনাকে দেখে হাসল লিয়া। রানা ওদেরকে লক্ষ করছে। নিজের কাপটা সুসিনার হাতে ধরিয়ে দিল লিয়া। কাপটা নেওয়ার সময় সুসিনার মুখের হাসিটুকু নিঃশেষে মুছে গেল, চেহারায় ফুটল বিহ্বল একটা ভাব। লিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, সে যেন জাদু করেছে তাকে।

দশ মিনিট পর অ্যাডামাস জেটিতে ভিড়ল বোট। বুড়ো স্কিপারের বাকি পাওনা মিটিয়ে দিল রানা, বেশ ভাল বকশিশও দিল। 'মাইকোনোস হারবার মাস্টারের কাছে তোমার সেইল ফাইল করেছিলে–আমি যেভাবে করতে বলেছিলাম?' জানতে চাইল ও।

'হ্যাঁ।'

'ধন্যবাদ। হ্যাপি সেইলিং।'

ব্যাগগুলো নিয়ে মেয়ে দুটোর কাছে হেঁটে এল রানা। সাদা চুনকাম করা বাড়িগুলোর সামনে চওড়া ফুটপাথ ও রাস্তা। রাস্তায় একটাই গাড়ি দেখা গেল–নীল সিড্যান, দরজায় সাদা রঙে লেখা, ট্যাক্সি।

ট্যাক্সির পিছন থেকে সহাস্যে বেরিয়ে এল রাইসুল লুককাস। রানার হাত থেকে প্রায় ছোঁ দিয়ে ব্যাগগুলো কেড়ে নিল সে। 'এত দেরি হলো কেন, মাসুদ ভাই?' ব্যাগগুলো ট্যাক্সির পিছনে তুলল সে।

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'একে দেরি বলে না।'

মাত্র পাঁচ ফুট লম্বা রাইসুল, ওজন একশো পাউন্ড। বয়স পঞ্চাশ বলে কসম খেলেও, দেখে মনে হয় ত্রিশ। লোকটা কোন কিছুই ধীরে-সুস্থে করতে জানে না, প্রতিটি কাজ ছুটোছুটি করে

করা চাই।

মুখটা সরু। হাড়ের উপর ত্বক সেঁটে আছে, মাংস নেই। হাসি কখনও ব্যাধি হতে পারে না, এ-কথা অন্তত রাইসুলের পামেলায় সত্যি নয়। তার সার্বক্ষণিক হাসি সহ্য করতে না পেরে এ পর্যন্ত তিনটে স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছে। অন্তত এটাই তার ব্যাখ্যা। পেশায় লোকটা এক সময় স্মাগলার ছিল। প্রায় পনেরো বছর রানা এজেন্সির ইনফরমার। তখনই বিশ্বস্ততা অর্জন করে। বর্তমানে এজেন্সির লোকাল এজেন্ট সে।

'ভিলা রেডি। নতুন তিন বউকে দিয়ে সব পরিষ্কার করিয়েছি। ফিরে দেখব লাঞ্চ রেডি। এবার, মাসুদ ভাই, পরিচয় করিয়ে দিন।'

'সুসিনা।'

সুসিনার হাত ধরে উল্টোপিঠে চুমো খেল রাইসুল। 'সুখী হও।' রানার দিকে তাকাল। 'চোখ দুটোয় পাথুরে ভাব কেন?'

'ও ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।'

'ও,' বলে লিয়ার দিকে ফিরল রাইসুল। 'আর আপনি, মাদাম?'

'ও লিয়া বারকা।'

'লিয়া বারকা, আমার বিবেচনায় আপনি দুনিয়ার সেরা সুন্দরী। একটু সাবধানে থাকবেন, কারণ আমার আবার বিয়ে করবার বাতিক আছে।'

'এ কী অসভ্যতা!' রাগে এক পা পিছিয়ে এল লিয়া, রানার দিকে তাকাল।

'আরে, ও তো ঠাট্টা করছে!'

'সবাইকে মাইলোসে স্বাগতম!' চেঁচিয়ে উঠল রাইসুল।

লিয়ার চেহারা থেকে রাগ মুছে গেল, তার বদলে বিস্ময়ে বড়বড় হয়ে উঠল চোখ দুটো। এবার বন করে আধপাক ঘুরে রানার দিকে তাকাল সে। 'মাইলোস?'

'হ্যাঁ,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'আমি সিদ্ধান্ত পাল্টিয়েছি।'

লাঞ্চে বসে অনর্গল বকবক করে যাচ্ছে রাইসুল। সুসিনা বরাবরের মত চুপচাপ। রেগে আছে একা শুধু লিয়া, তার অস্থির চোখের ধারাল দৃষ্টি বারবার বিদ্ধ করছে রানাকে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে রাইসুলের ছোট বউ লিয়া আর সুসিনাকে যার যার কামরায় পৌঁছে দিতে নিয়ে গেল। রানাকে নিয়ে টেরেসে বেরিয়ে এল রাইসুল, দু'জনের হাতেই কফির কাপ।

'আমাদের অ্যাথেন্স শাখা কতটুকু জানিয়েছে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল পাঁচ ফুটী রাইসুল। 'যতটুকু আমার জানা দরকার, সব। আপনি খুব বড় একটা মিশন নিয়ে এসেছেন। রহস্যটার চাবি আছে বোবা মেয়েটার কাছে।'

'আর?'

'আপনার একটা সেফ হাউস দরকার–যতক্ষণ না ওই শাইখ লোকটাকে জেল থেকে বের করা যায়।'

'হ্যাঁ, মোটামুটি সবই জানো।'

'ভাল কথা, মাসুদ ভাই, আপনার জন্যে একটা মেসেজ আছে। আমাদের লন্ডন শাখার ল্যাবরেটরি থেকে আজ সকালে অ্যাথেন্স শাখায় ফোন করা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, ফটোগুলো লন্ডন শাখাতেই পাঠাবার কথা...'

'ওরা জানিয়েছে, ফটো দেখে তেমন কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। আকারে বড় হয়ে যাওয়ায় ঝাপসা হয়ে গেছে...'

'জানতাম এরকম কিছু বলবে।'

'আজ বিকেলে ওরা একজন এক্সপার্টকে পাঠাচ্ছে, তার সঙ্গে একজন সহকারীও থাকবে–আসল জিনিসটা পরীক্ষা করার জন্যে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ফোন থেকে এখনও অ্যাথেন্সের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা যাচ্ছে তো?'

সাবেক গ্রিক স্মাগলার মাথা ঝাঁকাল। 'ওদিকে, বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে—আমার অফিস রুমে ফোনটা। আপনি যেমন নির্দেশ দিয়েছেন, ভিলার সব কানেকশন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে।'

'আমরা ভিলায় ওঠায় তোমরা কোথায় থাকছ?'

হেসে উঠল রাইসুল। 'আমাদের আবার থাকার জায়গার অভাব!'

'তবু?'

'থ্রি স্টার হোটেলটায় থাকব—অলিম্পিয়ায়।'

'তুমি ওটারও নিশ্চয় মালিক?'

'জী, মাসুদ ভাই।' হাসিটা রাইসুলের মুখে লেগেই আছে। 'আরও ধরুন—চারটে বার, তিনটে রেস্তোরাঁ, দুটো হোটেল, এখান থেকে সামনে সাগর পর্যন্ত আর পিছনে পাহাড় পর্যন্ত সমস্ত জমি, বেশির ভাগ মাছ ধরার নৌকা—সবই আপনাদের দোয়ায়।'

'বেশির ভাগই তো অসৎ পথে কামিয়েছ। কিছু দান-খয়রাত করো?'

'স্থানীয় সরকার বেছে বেছে মুসলমানদের জমি হুকুমদখল করে বন্দর, এয়ারপোর্ট, খেলার মাঠ, সরকারী ভবন এই সব বানিয়েছে। আমার বাপের আমলের ঘটনা। আজও আমি ক্ষতিপূরণ পাইনি।' গম্ভীর রাইসুল। 'এবার আপনিই বিচার করুন, স্মাগলার না হয়ে কী করার ছিল আমার?'

'তোমাকে আমি কী জিজ্ঞেস করলাম, আর তুমি...'

'দুঃখিত, মাসুদ ভাই। হ্যাঁ, দান-খয়রাত করি বৈকি—তবে যা দেই সবই শুধু মুসলমানদের।' একটু থেমে আবার বলল রাইসুল, 'আমার প্রতি আপনার কোন জরুরি নির্দেশ থাকলে বলুন, মাসুদ ভাই।'

'আছে। আমি চাই, সুসিনা এখানে শান্তি আর আরামে

থাকুক। তোমার ছোটবউ ওকে গ্রামে নিয়ে গিয়ে কিছু কাপড়চোপড় আর অন্যান্য যা কিছু ওর দরকার কিনে দিক সব। পুলে নামতে চাইতে পারে, একটা বেইদিং সুটও যেন কেনা হয়।'

'শুধু সুইমিং পুলের কথা বলছেন।'

'হ্যাঁ। ভুলেও ওকে তোমার সৈকতের দিকে নিয়ে যাবে না বা যেতে দেবে না।'

'আর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা মাদামের পামেলায় কী নির্দেশ, মাসুদ ভাই?'

'তার ওপর কড়া নজর রাখবে। ভিলা ছেড়ে কোথাও যদি যায় সে, তোমাদের পাহারা হবে নিশ্ছিদ্র পরদার মত।'

'গফুরাস আর আলতামাস ওদিকটা দেখবে। ওরা ভিলাতেই থাকছে। আর গেটে চব্বিশ ঘণ্টা একজন লোককে দাঁড় করিয়ে রাখছি।'

'রানা?'

ঘুরল রানা। লিয়া বেরিয়ে আসছে টেরেসে। ঢিলে-ঢালা সাদা ড্রেসে পরীর মতই লাগছে তাকে, মাথায় ম্যাচ করা একটা হ্যাট–দেখতে অনেকটা পাগড়ির মত। 'বলো।' হাসল রানা।

'আমি একবার গ্রামে যেতে চাই। আমার কিছু জিনিস দরকার।'

'এই ভিলায় সবই পাবে তুমি। কিংবা কী লাগবে বলো, রাইসুল আনিয়ে দেবে।'

'না, ভিলায় নেই। তা ছাড়া, ওগুলো কাউকে দিয়ে আনাবার জিনিস নয়··· মেয়েলি।'

রানা আর রাইসুল দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর লিয়ার দিকে পিছন ফিরল রানা। 'ঠিক আছে, রাইসুল তোমাকে গাড়ি করে নিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' উৎসাহের সঙ্গে বলল রাইসুল।

'ধন্যবাদ।' পাথুরে ধাপে হাইহিলের খট-খট আওয়াজ তুলে

গাড়ি-বারান্দার দিকে নেমে গেল লিয়া।

'রাইসুল, কোন অবস্থাতেই একে তুমি চোখের আড়াল করবে না। আর দেখবে, কোন টেলিফোনের ধারেকাছেও যাতে ঘেঁষতে না পারে,' হিসহিস করে বলল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে লিয়ার পিছু নিল রাইসুল।

ভিলার ভিতর ঢুকে গফুরাসকে পেল রানা। 'সুসিনার কামরাটা কোথায়?' জানতে চাইল।

'ছোট স্যুইটটা দেয়া হয়েছে তাঁকে,' সমীহের সঙ্গে জবাব দিল পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের গ্রিক তরুণ। 'সিঁড়ির মাথায় উঠে ডান দিকে যাবেন—দ্বিতীয় দরজাটা।'

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠল রানা। দরজায় মৃদু টোকা দিল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কবাট খুলে গেল। গায়ে অন্তত তিন সাইজ বড় একটা রোব জড়িয়ে রেখেছে সুসিনা। ভেজা চুল মাথায় সেঁটে আছে দেখে বোঝা গেল এইমাত্র শাওয়ার সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে।

'তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে, সুসিনা। আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। ঠিক আছে তো?'

জবাবে রানার হাত ধরে টান দিল সুসিনা, ঝুল-বারান্দায় বের করে আনল ওকে। লম্বা করা অপর হাতটা একদিক থেকে আরেকদিকে নাড়ল সে, বন্দর আর গ্রাম সহ গোটা এলাকাটা দেখাতে চাইছে। এরইমধ্যে, বোধহয় আনন্দের আতিশয্যে, রানার গায়ে হেলান দিয়েছে সে। সারা মুখে মৃদু হাসি খেলা করছে। রানা বুঝতে পারল কী বলতে চাইছে মেয়েটা।

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর। তা হলে এখানেই বসি আমরা, কেমন? বেশ। এসো, কথা বলি। তুমি লিখতে পারো, সুসিনা?' হাত দিয়ে কলম চালাবার ভঙ্গি করে দেখাল রানা।

মাথা নাড়ল সুসিনা।

'কিন্তু তুমি তো লিখতে পারতে। বোর্ডিং স্কুলে ছিলে তুমি,

মনে নেই? স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছিলে?'

চুপ করে থাকল মেয়েটা।

'সাড়ে তিন বছর আগের কথাও কি তোমার মনে পড়ে না?'

একটু দেরি করে আবারও মাথা নাড়ল সুসিনা।

'ঠিক আছে, ভুলে যাও। আচ্ছা, তুমি কি লিয়াকে ভয় পাও?'

না।

'সে কি তোমাকে অন্য কারও কথা বা অন্য কোন জায়গার কথা মনে করিয়ে দেয়?'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সুসিনা।

হয়তো।

'কিন্তু তুমি ঠিক মনে করতে পারো না?'

না।

'মনে আছে, পিঠে কখন উল্কিটা আঁকা হয়?' হাত দিয়ে নিজের পিঠ ছুঁলো রানা।

না।

কোন কাজ হচ্ছে না, তবু আরও একটা জিনিস পরীক্ষা করে দেখতে হবে রানাকে। গোড়ালির উপর স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা হোলস্টার থেকে ওয়ালথারটা বের করে দু'জনের মাঝখানে টেবিলের উপর রাখল ও।

সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পাওয়া গেল। সুসিনার মুখ থেকে সমস্ত রঙ মুছে গেল। চেয়ার থেকে এমন লাফ দিল, ওটায় যেন আগুন ধরে গেছে। ঝুল-বারান্দার রেইলিং-এর দিকে পিছু হটবার সময়ও পিস্তলের দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

ওয়ালথারটা তাড়াতাড়ি আবার আগের জায়গায় লুকিয়ে ফেলল রানা। ধীর পায়ে, সাবধানে এগোল সুসিনার দিকে, অভয় দিচ্ছে নরম সুরে। দু'হাত দিয়ে হালকাভাবে ধরতে, মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে, আবার সে শান্ত আর স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এল।

'রাইসুল তোমাকে এক সময় গ্রামে নিয়ে যাবে, কেমন? যা খুশি তাই কিনতে পারবে তুমি। এই ভিলাটা আপাতত তোমার বাড়ি। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল সুসিনা। হাসি হাসি ভাবটা আবার ফিরে এসেছে মুখে।

সাইকিয়াট্রিস্ট না হলেও, রানা উপলব্ধি করল প্রয়োজন হলে সুসিনার স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে পারবে ও। পিস্তল দেখে তার যে প্রতিক্রিয়া হলো, সমস্যার সমাধান এর ভিতরই লুকিয়ে আছে।

সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এল। কমবেশি দু'ঘণ্টা হতে চলেছে নীচের উঠানে পায়চারি করছে রানা।

শামিম হায়দার আর তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে রাইসুলের এক লোক এয়ারপোর্ট থেকে ভিলায় নিয়ে এসেছে। লন্ডন থেকে অ্যাথেন্স, অ্যাথেন্স থেকে প্লেন বদলে আবার মাইলোস–দীর্ঘযাত্রা, অথচ দু'জনের একজনকেও রানার ক্লান্ত মনে হয়নি। পৌঁছানোর মাত্র পাঁচ মিনিট পরই কাজে হাত দিতে চাইল তারা। ইতিমধ্যে পরিচয় পর্ব শেষ হয়েছে। জানা গেছে অ্যাসিস্ট্যান্ট মেয়েটা, প্রভাতি হায়দার, তার স্ত্রী। দু'জনেই সাইফার সম্পর্কে এক্সপার্ট।

'মিস্টার রানা···?'

রানার পায়চারিতে বাধা পড়ল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে শামিম, চশমা জোড়া একটা খাপে ভরে রাখছে।

'মিস্টার বাদ, শামিম,' বলল রানা। 'বয়সে ছোট হলেও এজেন্সির সবাই আমাকে মাসুদ ভাই বলে ডাকে।'

'জী, ঠিক আছে।'

'তো কী বলবে বলো।'

'ঠিক যা সন্দেহ করেছিলাম, মাসুদ ভাই। যত ভাল ক্যামেরাই হোক, ফটো তুলে কোন লাভ নেই, ঝাপসা আর ছেঁড়া ছেঁড়া উঠবে। উল্কিটা যখন করা হয়, তারপর থেকে ওই জায়গার চামড়া

সর্বদিকে বিস্তৃত হয়েছে। তা ছাড়া, রঙ উঠে গেছে, মুছে গেছে কালিও।'

'তোমার স্ত্রী কিছু করতে পারবে বলে মনে করো?'

'ও তো বলছে পারবে। আমরা পরিষ্কার প্লেটে একটা সলিড ইমেজ তুলেছি, তারপর ট্র্যান্সফার করেছি একটা নেগেটিভে। আমাদের একজন ফিজিশিয়ানের কাছ থেকে পেয়েছি বয়স অনুসারে তৈরি করা ওজনের চার্ট এবং অন্যান্য কমপিউটেশন, এ-সবের সাহায্য নিয়ে আশা করা যায় প্রভাতি আসল উল্কিটা রিপ্রোডিউস করতে পারবে। ও এখন ইমেজটাকে ছোট করছে।'

শামিম থামতেই খোলা ফ্রেঞ্চ ডোর দিয়ে বেরিয়ে এল প্রভাতি।

'এই নিন আসলটা,' বলল সে, বড়সড় একটা প্রিন্ট ধরিয়ে দিল রানার হাতে। 'দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে–স্কিন থেকে সরাসরি লিফট্–আপনার ফটোর চেয়ে অনেক ভাল রেজাল্ট দিয়েছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে প্লেটটা শামিমের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। শামিম এরই মধ্যে চোখে ম্যাগনিফাইং গ্লাস আটকাতে শুরু করছে।

'হ্যাঁ, কিছু চিহ্ন পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে। প্রজাপতির ডানায় সংখ্যাও দেখতে পাচ্ছি আমি। তবে সবই বিচ্ছিন্ন, কাছাকাছি নয়; ফলে এগুলোর অর্থ করা খুব কঠিন হবে।'

'আর এই নাও রিডাকশন করাটা। এরচেয়ে বেশি আসলটার কাছাকাছি পৌঁছানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

রানা আর শামিম দ্বিতীয় প্রিন্টটা বেশ কয়েক মিনিট ধরে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল।

'আগেরটার চেয়ে অনেক পরিষ্কার,' বিড়বিড় করল শামিম। 'আমি বলব, ফাইল বা মাইক্রোফিল্ম যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, এটা সেই জায়গার চাবি।' আরও মগ্ন হয়ে পরীক্ষা করছে

সে।

রানা ব্যাপারটা ভাল বুঝছে না, ফলে খানিকটা অসহায় বোধ করছে।

পাঁচ মিনিট পর প্রায় চেঁচিয়ে উঠল শামিম। 'বুঝেছি! আবদাল শাইখের মাথায় ল্যাটিচিউড আর লঙ্গিচিউড আছে, আর আছে একটা নামের চাবি।'

'কিন্তু মাইক্রোফিল্ম কোথায়?'

'একটা কবরে,' জবাব দিল শামিম।

'কবরে!'

'কবরটা, জানা কথা, কোনও একটা কবরস্থানে আছে। সেই কবরস্থানের নাম হলো–আওয়ার লেডি অভ দা ব্লিডিং হার্ট।'

মুহূর্তের জন্য ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল রানার। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'ওই নামের কবরস্থান দুনিয়ার প্রায় সব দেশে এক-আধটা পাওয়া যাবে।'

'যাবেই তো।' একমত হয়ে মাথা ঝাঁকাল শামিম। 'আর সেজন্যেই শাইখ সাহেবের মাথায় যা আছে তা আপনাকে জানতে হবে।'

বিছানায় শুয়েছে রানা। বেডসাইড ল্যাম্পটা নেভাতে যাবে, মৃদু নক হলো দরজায়।

'ইয়েস?'

'আমি…লিয়া। ভেতরে আসতে পারি?' দরজা খুলে ঢুকল লিয়া। পায়ের ধাক্কায় বন্ধ করল কবাট, হেলান দিল দরজার গায়ে। হাত দুটো তুলে দেখাল রানাকে–একটায় ব্র্যান্ডির বোতল, আরেকটায় দুটো গ্লাস রয়েছে। 'নাইটক্যাপ?'

'হোয়াই নট?'

টেবিলের সামনে এসে থামল লিয়া। দুটো গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢেলে একটা রানার হাতে ধরিয়ে দিল। নিজেরটায় চুমুক দিচ্ছে। স্বচ্ছ

ড্রেসিং গাউনের নীচে কিছু পরেনি সে, মাঝখানের ফাঁকটা মাঝেমাঝেই চওড়া হয়ে উঠছে।

'তোমার শিষ্য, ওই বামুন লুককাসের কথা বলছি। সারাটা বিকেল ও আমাকে নজরবন্দি করে রাখল। চা খাওয়ার জন্যে যখন থামলাম, লোকটা এত অভদ্র যে আমার পিছু নিয়ে লেডিস রুমে পর্যন্ত ঢুকে পড়ল!'

'জানি,' জবাব দিল রানা। 'নির্দেশটা আমিই ওকে দিয়েছি।'

'কিন্তু কেন? আমাকে যা বলা হয়েছে, আমি কি তা করিনি?' গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল লিয়া। রানার একটা হাত ধরে নিজের ঊরুর উপর নিয়ে এল।

'সবই করেছ তুমি···আমি যা বলিনি, তাও।' দুটো আঙুল ওর মসৃণ ত্বকে বুলাচ্ছে রানা।

'তুমি সাইফার পেয়ে গেছ, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। ভাবল, কী সুন্দর লাগছে ওকে। সুন্দর আর ভয়ঙ্কর।

'শাইখ বেরুবে কবে?'

'আশা করি কাল।'

'তাকে আনার জন্যে আমি কি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি?'

'না। তুমি এখানে থাকবে।'

'কতক্ষণ?'

'যতক্ষণ না মাইক্রোফিল্মটা আমরা পাই, এবং যে যার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন না করে।'

আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় উঠে রানার পাশে শুলো লিয়া। 'এটাই তোমার শেষ কথা?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, দেখা যাবে,' অন্ধকারে ফিসফিস করল লিয়া। তার হাত রানার শরীরে।

কিছুক্ষণ কোন শব্দ নেই।

'তুমি সাড়া দিচ্ছ না,' আবার ফিসফিস করল লিয়া।

'সারাটা দিন খুব ধকল গেছে।'

কিন্তু রক্ত-মাংসের মানুষ তো। এক সময় লিয়ার হাতই জিততে শুরু করল।

'এসো, রানা…এখনই!' আকুল হয়ে আহ্বান জানাল লিয়া।

সক্রিয় হতে চেষ্টা করল রানা। কিন্তু কী যে হলো বলতে পারবে না, হঠাৎ সারা শরীর নিস্তেজ হয়ে গেল। তারপর অনুভব করল, নিজেকে অনায়াসে ছাড়িয়ে নিয়ে বিছানা থেকে নেমে যাচ্ছে লিয়া।

প্রচণ্ড ঘুম পাচ্ছে রানার। গ্লাস ঠোকাঠুকির শব্দ হতে বুঝতে পারল, ব্র্যান্ডিতে ড্রাগ মেশানো ছিল।

যাক, হাসল রানা আপন মনে। ভাবছে, রাতের ঘুমটা খুব ভাল হবে।

রাইসুল আর তার লোকজন লিয়াকে খুব বেশি দূরে যেতে দেবে না।

দশ

এক চোখ আর এক হাত দিয়ে ফুলস্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে রাইসুল। অপর চোখটা নোটবুকে নিবদ্ধ, অন্য হাতে ধরে আছে সেটা।

'মাদাম লিয়া রাত তিনটের দিকে ভিলা ছেড়ে বেরিয়েছে। গফুরাস এক লোককে দিয়ে হোটেলে খবর পাঠায় আমাকে।

মাদাম লিয়া গ্রামে গিয়ে একটা টেলিফোন করে।'

'ফোন নম্বরটা সংগ্রহ করেছ?' জানতে চাইল রানা।

'মাদাম লিয়া অপারেটরকে নম্বরটা না জানানো পর্যন্ত আমার লোক অপেক্ষা করে। মাদাম কানেকশন পায়নি, তার আগেই রিসিভারটা চেয়ে নেয় সে।'

নম্বরটা রাইসুলের মুখে শুনে মুখস্থ করে নিল রানা। মাইকোনোসে গ্রিক ফেউ ময়নিহানের যে নম্বর ওকে দিয়েছিল, এটা সেটা নয়।

'লিয়া এখন কোথায়?'

'আমার হোটেলে। এ-ধরনের কাজে ব্যবহার করা হয় এমন একটা বিশেষ কামরায় রাখা হয়েছে মাদামকে,' বলল রাইসুল। 'কামরাটা সাউন্ডপ্রুফ। দরজার বাইরে সারাক্ষণ একজন লোককে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

'পোলারয়েড ক্যামেরাটা কাজে লাগাতে পেরেছিলে?' জানতে চাইল রানা।

পকেট থেকে বের করে ভয়ানক ক্ষিপ্ত লিয়া বারকার একটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল রাইসুল।

লিয়ার পূর্ণদৈর্ঘ্য আগের ছবিটায় মুখের ছাপ ভালভাবে ফোটেনি। 'এটাতেও কাজ হবে কি না বলা মুশকিল,' মন্তব্য করল রানা।

'এরচেয়ে ভাল ছবি তোলা সম্ভব ছিল না, মাসুদ ভাই,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রাইসুল। 'এটা তুলতেই দু'জন লোককে দিয়ে তাকে চেপে ধরে রাখতে হয়েছিল।'

ফটোটা পকেটে ভরে রাখল রানা। এয়ার টার্মিনালের সামনে পৌঁছে রাইসুলও গাড়ি থামাল।

নীচে নেমে জানালার দিকে ঝুঁকল রানা। 'বড় কোন বিপত্তি না ঘটলে আজ রাতে শাইখকে নিয়ে ফিরে আসব আমি।'

'আপনাদেরকে ভিলায় নিয়ে যাবার জন্যে আমার লোকজন

পাঠিয়ে দেব আমি।'

'ঠিক আছে। শামিম আর প্রভাতিকে তোমার ভিলায় থাকতে দাও টুকরো-টাকরাগুলো জোড়া লাগাবার পর সাইফার ভাঙার কাজে আমি দেরি করতে চাই না।'

'জী, মাসুদ ভাই।'

লোকজনের মুখে চোখ বুলাতে বুলাতে টার্মিনাল ভবনে ঢুকল রানা। ও প্রায় নিশ্চিত, যে দল বা গ্রুপেরই লোকজন হোক তারা, তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালাচ্ছে রোডস্ আইল্যান্ডে, অবশ্য তবু সাবধানের মার নেই।

মাইলোসে একটাই এয়ার লাইন্স জনপ্রিয়, তাদের একটা ফ্লাইট ধরে অ্যাথেন্সে চলেছে রানা। প্লেনে উঠবার পর স্বস্তিবোধ করল ও।

হেলিনিকন এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি ওমোনিয়া স্কয়্যারে, অর্থাৎ ওর এজেন্সির অ্যাথেন্স শাখায় চলে এল রানা।

বিশাল একটা অ্যান্টিক শপ। কর্মচারীরা সবাই বাঙালী। দু'একজন ওকে চিনল, তবে তারপরও সাংকেতিক শব্দ উচ্চারণ করে নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা জানাল রানা।

দোকানের পিছনে অনেকগুলো কামরা। তারই একটায় বাংলাদেশ দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারিকে নিয়ে শাখা প্রধান নাসিমুল আকাশ অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

কুশল বিনিময়ের পরপরই রানা জানতে চাইল: 'শাইখের ব্যাপারটা চূড়ান্ত করা গেছে?'

'জী, মাসুদ ভাই,' জবাব দিল আকাশ। 'আজ দুপুর বারোটায় কোরিডালোস জেলখানার মেইন গেটে রিলিজ দেয়া হবে তাকে।'

'ওদিকে, ঢাকার সেন্ট্রাল জেল থেকে দু'জন গ্রিক স্মাগলারকে আজ সকালে মুক্তি দিয়েছি আমরা,' বাংলাদেশ দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারি জানালেন।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা, তেতো খবরটা ঢোক গিলে হজম করতে হলো। ওই লোক দু'জন হেরোইনসহ ঢাকায় ধরা পড়েছিল।

খুক করে কেশে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল আকাশ। 'মাসুদ ভাই, টেলিফোনে আপনি যে আয়োজনের কথা বলেছেন, ব্যাপারটা সেরকমই থাকবে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমার ধারণা, এটাই সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি। আমি যদি একটা গাড়ি নিয়ে হাজির হই, জেল গেট থেকে তাকে তুলে নিয়ে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিই—ওরা তা হলে হয়তো শুধু পিছু নেবে, কিন্তু নিজেদের চেহারা দেখাবে না। তুমি যে-সব লোককে কাজে লাগাচ্ছ, তারা কেমন?'

'নিজেদের কাজে তারা সেরা, মাসুদ ভাই। আর মার্সিডিজের ড্রাইভিং সিটে আমি নিজে থাকব।'

'শাইখ যখন জানতে পারবে যে ইজরায়েলিরাও তাকে ধরতে চায়, ভয়ে কুঁকড়ে যাবে সে,' বলল রানা। 'ফলে তাকে খানিকটা সহজে সামলাতে পারব আমরা।'

'হয়তো,' এক সেকেন্ড ইতস্তত করে বলল আকাশ। 'তবে, মাসুদ ভাই, এর মধ্যে বেশ বড় একটা ঝুঁকিও আছে।'

হেসে উঠল রানা, তারপর কৌতুক করবার লোভটা সামলাতে না পেরে বলল, 'সে তো সন্তানধারণেও আছে, তারপরও মেয়েরা প্রতিদিন প্রেগন্যান্ট হচ্ছে।' পরমুহূর্তে কাজের প্রসঙ্গে ফিরে এল আবার। 'অ্যাথেন্সের দুটো ফোন নম্বর চেক করবে তুমি। তার মধ্যে একটা "ময়নিহান" নামে কারও।' নম্বর দুটো একটা কাগজে লিখে দিল ও।

এই সময় বাংলাদেশ দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারি চেয়ার ছাড়লেন। 'এবার আমাকে উঠতে হয়...'

তাঁর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা। আকাশ তাঁকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল।

'সামি কাদরির অতীত তৎপরতা সম্পর্কেও একটু খোঁজ নিতে হবে তোমাকে,' আকাশ ফিরে আসতে বলল রানা। 'তালিকাটার বিনিময়ে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার প্রস্তাব এই গ্রিসে এসেই সোহানাকে দিয়েছিলেন তিনি।'

'মনে আছে, মাসুদ ভাই, ফাইলে পড়েছি।'

'আমি জানতে চাই, সোহানার সঙ্গে দেখা করার জন্যে কীভাবে তিনি বুলগেরিয়া থেকে বেরিয়েছিলেন। মোসাদ তাঁর ওপর নজর রাখত, ফাঁকি দিলেন কীভাবে। আরও একটা কাজ–রাজধানী সোফিয়ায় আমাদের লোকজন আছে, ওদেরকে পুরনো খবরের কাগজ সংগ্রহ করে রিসার্চ করতে হবে।'

'কত পুরনো?'

'সাড়ে তিন, চার বছরের।'

'কী খুঁজবে তারা?'

'হয়তো কিছুই নয়,' বলল রানা, লিয়ার পাসপোর্ট সাইজের ফটোটা বাড়িয়ে দিল আকাশের দিকে। 'দেখতে হবে এই মেয়েটার কোন ছবি সে-সময়কার কোন দৈনিকে বা ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল কিনা।'

'লিয়া বারকা?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'দিন কয়েক আগে একদল ইজরায়েলি অ্যাথেন্সে তাকে খুন করতে চাইছিল। গোটা ব্যাপারটা সাজানোও হতে পারে, আমি যাতে তাকে বিশ্বাস করি। আবার, এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে তেল আবিবের কোন কর্মকর্তা আমাদের চেয়ে ভালভাবে চেনে লিয়াকে, নিজের গুরুতর কোন অপরাধ গোপন রাখার স্বার্থে তাকে সরিয়ে দিতে চাইছে।'

'দেখছি কী করা যায়,' বলে একটা ম্যাপের ভাঁজ খুলে রানার দিকে ঠেলে দিল আকাশ। 'এবার আসুন, মাসুদ ভাই, আপনার ইস্কেপ রুটটা ফাইনাল করে ফেলি।'

অ্যাথেন্স শহর আর বন্দরের মাঝখানে ফাঁকা একটা এলাকায় কোরিডালোস কারাগার, কালচে আর ধূসর পাথরের অশুভদর্শন একটা প্রাচীন কেল্লা।

দুপুরের সূর্য আগুন ঝরাচ্ছে কারাগারের প্রধান ফটক আর কাফের মাঝখানের পাথুরে রাস্তাটায়। এই কাফেরই জানালার ধারে একটা টেবিল নিয়ে বসে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে রানা। পথিক, ফেরিওয়ালা, হকার, ভেসপা, বাইসাইকেল আর ট্যাক্সি পানির প্রবল স্রোতের মত ছুটছে দু'দিকে।

'আরেকটা?'

মুখ ফিরিয়ে ওয়েটারকে দেখে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'একটা আমার জন্যে, তিনটে আমার বন্ধুর জন্যে। একটু পর পৌঁছাবে সে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাস্তার ওপারটা দেখাল ওয়েটার। 'কোরিডালোস?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বরং পাঁচটা দিয়ে যাই। ওরা বেরিয়ে এসে কী করে, আমার অভিজ্ঞতা আছে।'

বিয়ারগুলো নিয়ে ফিরে এলে তাকে বেশ ভাল বকশিশ দিল রানা। লোকটা আরও একটা সার্ভিস দিচ্ছে ওকে। কাফের পিছনের দরজার উপর চোখ রাখছে সে, বেরুবার সময় সেটা যাতে খোলা আর নির্জন পায় ওরা।

দশ মিনিট পর ফটকের গায়ে ইস্পাতের বড় দরজাগুলোর একটা খুলে যেতে দেখল রানা। প্রথমে বেরুল একজন ইউনিফর্ম পরা গার্ড। তারপর একজন সিভিলিয়ান। সবশেষে আরেকজন গার্ড।

সিভিলিয়ান লোকটা আবদাল শাইখ।

গার্ডদের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে সামনে এগোল সে, রাস্তা

পেরিয়ে কাফের দিকে আসছে।

বেশ অনেক বছর পর তাকে দেখছে রানা। শরীরটা এখনও তার প্রকাণ্ড। দাড়িতে কলপ লাগাত, মনে আছে ওর, সেটা কেটে ফেলেছে। গোঁফ জোড়া আরও লম্বা হয়েছে। ঠোঁটের কোণ এমন কুঁচকে আছে, যেন এখনই খেঁকিয়ে উঠবে। চোখের নীচে কালি।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু'দিকে চোখ বুলাল শাইখ। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে জেলখানাটা একবার দেখে নিল।

কাফেতে ঢুকে তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি সহজেই খুঁজে নিল রানাকে। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে টেবিলের কাছে দাঁড়াল, একটা গ্লাস তুলে মাত্র চার ঢোকে খালি করল সেটা। হাতে দ্বিতীয় গ্লাস, চোখ বুলাল চারদিকে—দৃশ্য, শব্দ আর গন্ধ নিচ্ছে, উপভোগ করছে মুক্তির স্বাদ।

দ্বিতীয় গ্লাসটাও মাত্র কয়েক ঢোকে নিঃশেষ করল শাইখ। খালি চেয়ারটায় বসল। তারপর একটা হাত বাড়াল রানার দিকে। 'কেমন আছেন, সার? ম্যাডাম শাফুরা কেমন আছেন?'

'আমরা ভাল,' হাতটা ধরল রানা।

'ম্যাডাম শাফুরা...'

কথাটা তাকে শেষ করতে দিল না রানা। 'তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত।'

'বেশ। আমি আর যে-সব জিনিস চেয়েছিলাম, সে-সব কোথায়?'

মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটো জিনিস চেয়েছিল শাইখ—বিয়ার আর পিস্তল। বেল্ট থেকে টেনে একটা মাউজার বের করল রানা, টেবিলের তলা দিয়ে ধরিয়ে দিল শাইখের হাতে।

'চাওয়ামাত্র পেয়ে গেলাম!' হাসল শাইখ। 'ধন্যবাদ, সার।'

'পেলে, তার কারণ, রাস্তার কোথাও কয়েকটা দল তোমাকে খুন করার জন্যে ওত পেতে আছে।'

'সেক্ষেত্রে রাতের অন্ধকারে, প্রাইভেট গেট দিয়ে কেন আমাকে বের করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি?'

'কারণ, তোমার প্রাণ বাঁচাবার একটা সুযোগ খুঁজছি আমি, তুমি যাতে আমার প্রতি ঋণী হতে পারো।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল আবদাল শাইখ। 'সার, আপনি সেই আগের মতই পাষাণ আছেন।' হাতের গ্লাসটা কপালের পাশে তুলে স্যালুট দেওয়ার ভঙ্গি করল সে।

সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল রানা। তারপর জানাল, এখন থেকে ওর কথাতেই সব কিছু চলবে, ওর প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলতে হবে শাইখকে।

'রাজি। আমার শুধু টাকা দরকার।'

শাইখের হাতে একটা সুইস পাস বুক ধরিয়ে দিল রানা। 'তোমার নামে অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। তোমার কথার সঙ্গে যখনই সব মেলাতে পারব, তখনই শুধু অর্ধেক টাকা জমা পড়বে ওই অ্যাকাউন্টে।'

'ও, আপনি তাহলে জানেন যে সব টাকা আমি পাচ্ছি না? মিস্টার কাদরি মাত্র অর্ধেক নিতে বলেছেন আমাকে?'

'সোহানা জানত, কাজেই আমিও জানি।'

'আর মেয়েটার টাকা? সেটা আপনারা রেখে দেবেন?'

'অবশ্যই। তারটা তাকেই বুঝিয়ে দেয়া হবে।'

'কিন্তু তার বাবা আমাকে একটা দায়িত্ব দিয়ে গেছেন...

'সে দায়িত্ব তোমার চেয়ে অনেক ভালভাবে পালন করতে পারব আমরা,' বলল রানা। 'এ প্রসঙ্গের এখানেই ইতি, শাইখ।'

কাঁধ ঝাঁকাল শাইখ। 'এখন?'

'এখান থেকে বেরুব।' টেবিল ছেড়ে পথ দেখাল রানা। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখল গলিটা একদম খালি। 'এদিকে!'

গলির মুখ থেকে চৌরাস্তার দিকে হাঁটছে ওরা। একশো গজও

এগোতে পারেনি, রানা অনুভব করল লোকজন কাছে চলে আসছে।

ঠোঁটের কিনারা দিয়ে কথা বলল রানা। 'চৌরাস্তার কিনারায় একটা মোটর সাইকেল আছে, ওটার আরোহী আমাদের পথ আটকাবে। পিছন থেকে আসবে আরও দু'জন।'

'আচ্ছা।'

'তুমি পিছনের লোক দু'জনকে সামলাবে, শাইখ। আমি সামনেরটাকে।'

'গুলি করব...দিনে দুপুরে?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তারপর চৌরাস্তা ধরে দৌড়াব আমরা।'

'দৌড়ে যাবটা কোথায়?'

'চারজন লোক আমাদেরকে ধরে একটা সাদা মার্সিডিজে তুলবে। ওদের সঙ্গে আবার ধস্তাধস্তি কোরো না।'

'আপনার লোক?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝছি না।'

'বুঝবে,' বলে মুচকি একটু হাসল রানা।

স্কয়্যার বা চৌরাস্তায় প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় তাদেরকে দেখতে পেল রানা। তিন গ্রুপে ভাগ হয়ে আসছে দলটা। প্রথম গ্রুপ সামনে, পরনে ট্যুরিস্টদের মত রঙচঙে কাপড়চোপড়, মাঝখানের ফোয়ারা থেকে রওনা হলো। পায়ে হেঁটে আসছে, সংখ্যায় তারা তিনজন।

গলি থেকে বেরুল চারজন, বেরিয়ে দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে গেল। এদেরকেও বিদেশী ট্যুরিস্ট মনে হচ্ছে। দু'জন ওদের বাম দিক থেকে, দু'জন ওদের ডানদিক থেকে আসছে।

প্রত্যেকে তারা দীর্ঘদেহী, চোখে-মুখে শীতল ভাব। মাইকোনোসে যে দু'জন গ্রিক ফেউকে রানা দেখেছিল, তাদের সঙ্গে এদের কোন মিলই নেই। এরা যে শুধু বিদেশী, তা নয়,

হাবভাব দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে নিজেদের কাজ তারা খুব ভাল বোঝে।

সন্তুষ্টচিত্তে হাসল রানা—মনে মনে। অস্টির-এ, রেস্টুরেন্টের বাইরে, লিয়া আর ওর উপর যে চারজন লোক হামলা করেছিল, এদের মধ্যে, তাদের কেউ নেই।

তারপর আরেক দল যেন হঠাৎ আকাশ থেকে নেমে এল। এরা উদয় হলো দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে। বড় আকারের মোটর সাইকেলের আওয়াজ ঘেরা চৌরাস্তার ভিতর কানের পরদা ফাটিয়ে দিতে চাইল। রানা ঘাড় ফেরায়নি। মোটর সাইকেলের গর্জন তুলে পিছন থেকে যারা আসছে তাদের ব্যবস্থা শাইখই করতে পারবে বলে আশা করছে ও।

তারপর ওদের সামনে যান্ত্রিক গর্জনের উৎসটা দেখতে পেল রানা। আপাদমস্তক কালো, এমনকী হেলমেট আর ভাইজারটাও তাই, বিরাট একটা বিএসডব্লিউ ছুটিয়ে কাছে চলে আসছে একজন রাইডার। একটা প্রাইভেট কারকে পাশ কাটাল সে, দেখতে পেল রানাকে, সঙ্গে সঙ্গে কী এক কৌশলে মোটরসাইকেলটাকে রাস্তার উপর কাত করে ফেলে দিল।

ব্যাপারটা কাকতালীয়, না কি রাইডারের কেরামতি, বলা মুশকিল—প্রকাণ্ড মোটরসাইকেল রাস্তার উপর ঘষা খেয়ে রানার পায়ের সামনে এসে স্থির হলো।

রাইডার আগেই ডাইভ দিয়েছে। শরীরটাকে গড়িয়ে দিল সে। তারপর যখন হাঁটুর উপর সিধে হলো, দেখা গেল দু'হাতে একটা পয়েন্ট ফোরটি-ফাইভ ধরে আছে।

'নাউ!' লোকটা ডাইভ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাঁজ করা একটা হাঁটু গেড়েছে রানা রাস্তায়, লম্বা করা হাতে ওয়ালথার। ঠিক দেখেনি, অনুভূতি দিয়ে বুঝতে পারল—ওর পাশে, পিছন ফিরে, শাইখও এই একই কাজ করছে।

'আপনি বলছেন?' জিজ্ঞেস করল সদ্য কারামুক্ত গ্রিক

ক্রিমিনাল।

'বলছি,' ভারী গলা রানার।

চৌরাস্তার মাঝখানে শাইখের মাউজার কামানের মত গর্জে উঠল দু'বার। রানার হাতে ওয়ালথারটা উঠল খেঁকিয়ে।

ওর সামনের রাইডার পিছন দিকে একটা ডিগবাজি খেল। রাস্তার উপর উপুড় হলো সে, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকল।

ঝট্ করে একবার পিছন দিকে তাকিয়ে নিশ্চিত হলো রানা, বাকি দু'জন হেলমেট পরা রাইডারকে শুইয়ে দিয়েছে শাইখ।

ব্যাপারটা যখন শুরু হতে যাচ্ছিল, মজা দেখবার জন্য আশপাশ থেকে কাছে চলে আসছিল চৌরাস্তার লোকজন। দায়ী সম্ভবত রক্তপিপাসা, অনুভবে ধরা দিয়েছিল ভাল একটা লড়াই শুরু হতে যাচ্ছে।

অস্ত্র দেখে থমকে দাঁড়ায় তারা। গোলাগুলি শুরু হতেই যে যেদিকে পারে খিঁচে দৌড়াচ্ছে।

এই মুহূর্তে চৌরাস্তা জুড়ে মহা বিশৃংখলা।

সাতজনের তিনটে গ্রুপ, যারা রানা আর শাইখের দিকে এগিয়ে আসছিল, তাদে কেও বাধ্য হয়ে পিছু হটতে হলো।

'চলো, কেটে পড়ি!' চাপা গলায় বলল রানা।

দৌড়াবার সময় ফাঁকা গুলি করল ও। ওর পিছু নিয়ে শাইখও তাই করছে। ওদের সামনে মানুষের ভিড় দু'ফাঁক হয়ে যাচ্ছে।

ব্লকটা পুরো পার হয়নি, পাশের একটা গলি থেকে স্যাাৎ করে বেরিয়ে এসে ব্রেক কষল সাদা একটা মার্সিডিজ।

'এরা?' শাইখ হাঁপাচ্ছে।

'এরা,' বলল রানা, দৌড়ের গতি কমায়নি।

মার্সিডিজ ওদের পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। অকস্মাৎ দরজাগুলো খুলে গাঢ় রঙের ওভারঅল পরা চারজন লোক নীচে নামল, প্রত্যেকে স্কি মাস্ক পরে আছে। নীচে নেমেই ছড়িয়ে পড়ল তারা।

দু'জন তারা রাস্তায় হাঁটু গেড়ে কুৎসিতদর্শন উজি সাব মেশিন

গান তুলল ভিড় লক্ষ্য করে।

তৃতীয় আর চতুর্থজন রানা আর শাইখের ঘাড়ে হাত রাখল, দু'জনের কপালের পাশে যে যার পিস্তল চেপে ধরেছে।

'গাড়িতে! গাড়িতে!' চেঁচাচ্ছে তারা।

ধাক্কা দিয়ে গাড়ির ব্যাক সিটে তুলে দেওয়া হলো রানাকে। দু'সেকেন্ড পর ওর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ল শাইখ।

দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। লাফিয়ে গাড়িতে উঠল অস্ত্রধারী চারজন। পাথরের সঙ্গে ঘষা খেল চাকা। ঝাঁকি খেয়ে ছুটল মার্সিডিজ।

গোটা ব্যাপারটা, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, সময় নিয়েছে আধ মিনিটেরও কম।

'আপনি ঠিক জানেন, বাইকের ওপর ওরা আমাদের লোক ছিল?' এখনও হাঁপাচ্ছে শাইখ।

'জানি,' জবাব দিল রানা।

'তা হলে ওদেরকে আমরা মারলাম কেন?'

'মারিনি,' হাসল রানা। 'ব্ল্যাঙ্কস্। তুমি নিশ্চয়ই আশা করো না, বিশ্বাস করে আসল অ্যামিউনিশন দেব তোমাকে?'

শাইখের শুধু ঠোঁট নড়ল, কোন আওয়াজ হলো না, তবে বোঝা গেল, বলছে, 'আশ্চর্য!'

স্কি মাস্ক পরা এক লোক সিটে বসে পিছনের কাঁচ দিয়ে বাইরেটা দেখছিল, সোজা হয়ে বসে রানার দিকে ঝুঁকল সে। 'মাসুদ ভাই, চৌরাস্তায় ওদেরকে বেছে বেছে গ্রেপ্তার করছে এখন পুলিশ, হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে জেরা করা হবে।'

'আমি সাতজনকে দেখেছি,' বলল রানা।

'আটজন—আরেকজন আপনার পিছনে ছিল। একে তো বিদেশী, তার ওপর সঙ্গে অস্ত্র আছে, কঠিন বিপদেই পড়বে ওরা। ওদের দূতাবাস অবশ্য কূটনৈতিক চাপ দিয়ে চেষ্টা করবে, সবাইকে যাতে ছেড়ে দেয়া হয়। তবে ওদের আসল পরিচয়

সম্পর্কে পুলিশের কাছ থেকে একটা ধারণা পাব আমরা।' স্কি মাস্ক খুলে ফেলে হাসল আকাশ। 'এবার বলুন, মাসুদ ভাই, শো-টা কেমন হলো?'

'এক কথায় দারুণ, আকাশ।'

'আপনি দয়া করে ব্যাখ্যা করবেন, সার, গোটা ব্যাপারটা কী নিয়ে?' কর্কশ গলায় জানতে চাইল শাইখ, উঠে বসছে সিটে।

'স্রেফ একটা থিওরি, তবে ধারণা করছি সত্যি বলেই প্রমাণিত হবে,' বলল রানা। 'আমার ধারণা ইজরায়েল, অর্থাৎ মোসাদ, আমাদের পিছনে এ আর বি টিম পাঠিয়েছে। এখন আমাদেরকে বের করতে হবে, কোন্‌টা আসলে কী।'

'আমি এখনও অন্ধকারে,' বলল শাইখ।

'ঠিক আছে, দেখো এভাবে ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায় কি না। ধরো, পায়ে হেঁটে যে-লোকগুলো কাছে চলে আসছিল তারা এ টিম। সাজানো ঘটনার সাহায্য নেয়া হয়েছে এই আশায় যে তারা ধরে নেবে আমাদেরকে বন্দি করেছে বি টিম।'

মাথা নাড়ল শাইখ। 'দূর ছাই! আর ব্যাখ্যা শুনতে করতে হবে না। দুর্বোধ্য! মাথা ধরে গেছে, একটু কফি পেলে মন্দ হোত না।'

আকাশের পাশে বসা আরেক আরোহী তার হাতে একটা ফ্লাস্ক ধরিয়ে দিল।

আকাশের দিকে ফিরল রানা। 'আমাকে তোমার কিছু রিপোর্ট করার নেই?'

'প্রচুর,' জবাব দিল আকাশ। রানার হাতে একটা ফোল্ডার ধরিয়ে দিল সে। 'দশ মিনিটের মধ্যে আমরা আপনাকে লঞ্চে তুলে দেব।'

ফোল্ডারটা পকেটে ভরে রাখল রানা। এতে কী বলা হয়েছে মোটামুটি ধারণা আছে ওর, তার পরেও লঞ্চে না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে শুনে ভীষণ অস্থিরতা অনুভব করছে।

এগারো

গাঢ় কালো আকাশে সরু এক চিলতে চাঁদটাকে কেমন যেন অবাস্তব লাগছে। শক্তিশালী লঞ্চটা বে-তে ঢুকল। গতি মন্থর। দ্বীপের পুব প্রান্তে পৌঁছাবে ওটা।

তীরে নেমে রানা অবাক হয়ে দেখল গাড়ির পাশে রাইসুল নিজেই ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কোন ঝুঁকি নিতে চাইনি, মাসুদ ভাই। ভাবলাম আমারই ড্রাইভ করা উচিত।'

খুশি হলো রানা। ব্যাকসিটে উঠে হেলান দিল ও। ভিলা পর্যন্ত এক ঘণ্টার পথ আরামে কাটবে।

ভিলায় পৌঁছে শাইখকে পথ দেখিয়ে বড় সেলুনটায় নিয়ে এল রানা। এখানে শামিম অপেক্ষা করছে।

'ঠিক আছে, শাইখ, সবাই আমরা সাড়ে তিন বছর ধরে অপেক্ষা করছি। এবার দাও!'

'লিয়া কোথায়?'

'এই মুহূর্তে গ্রামে সে, রাইসুলের থ্রি স্টার হোটেলে। রাইসুল তাকে আনতে গেছে। পৌঁছানো মাত্র তাকে আমি তোমার কামরায় পাঠিয়ে দেব। তখন তোমরা নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়ায় বা চুক্তিতে আসতে পারবে।'

এখন রানা জানে লিয়া বারকা আসলে কে বা কী, তবে শাইখকে কিছু বলছে না।

রানার বেশিরভাগ সন্দেহই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। আকাশের কাছ থেকে পাওয়া ফাইলে তাই বলা হয়েছে। লঞ্চ মাইলোসে ভিড়বার আগেই ফোল্ডারটা পুড়িয়ে ছাইটুকু সাগরের পানিতে ছড়িয়ে দিয়েছে ও।

তাতে যে-সব তথ্য ছিল, প্রয়োজনের সময় একটা শব্দও রানা ভুলবে না।

'আর কাদরি সাহেবের মেয়েটা?'

'নিজের চোখেই দেখো তাকে।' ওদের পাশের একটা পরদা সরাল রানা। জানালা দিয়ে বাইরের আলোকিত 'পুলটা পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা, পাশেই টেরেস।

শায়লা ওরফে সুসিনা টেরেসে ফেলা একটা টেবিলে বসে দূরে তাকিয়ে আছে, উপভোগ করছে সবুজ শ্যামল গ্রামীণ দৃশ্য। নরম, হালকা একটা সামার ড্রেস পরে আছে সে। মাঝেমধ্যে মৃদু চুমুক দিচ্ছে চায়ের কাপে। রাশি রাশি কালো চুল উড়ছে বাতাসে।

'বাহ্, ভারী সুন্দর লাগছে তো মেয়েটাকে।'

'আমরা এবার কাজ শুরু করতে পারি,' বলল রানা।

টেবিলে প্যাড আর পেনসিল নিয়ে শামিম হায়দারের মুখোমুখি বসল শাইখ। অত্যন্ত ধীর ভঙ্গিতে, তবে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, এক এক করে সংখ্যার ছয়টা গ্রুপ তৈরি করল সে, তারপর সেগুলোর সঙ্গে যোগ করল হরফের একটা কলাম।

প্যাডের উপর চোখ বুলিয়ে ওগুলো দেখল রানা, তারপর প্যাডটা শামিমের দিকে ঠেলে দিল। 'পাহাড়ের ওপর সেই রাতে ঠিক এগুলোই তোমাকে দিয়েছিলেন সামি কাদরি?'

'হুবহু,' মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল শাইখ।

সংখ্যা আর অক্ষরগুলোর উপর চোখ বুলাল শামিম, কিছু অঙ্ক কষল, তারপর মুখ তুলে তাকাল। 'কিছুটা হয়তো সময় লাগবে।'

'তা তো লাগতেই পারে,' বলল রানা। শাইখের দিকে

তাকাল। 'এসো, তোমার কামরাটা দেখিয়ে দিই। খাবার আর বাকি যা কিছু লাগে, রাইসুলের লোকজন দিয়ে যাবে এক সময়।'

দু'জনেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়েছে, এই সময় একটা নারী কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল বাইরের হল থেকে।

'কোথায় সে! কোথায় রানা, হারামির হাড্ডি!'

শাইখের কাঁধে একটা হাত রাখল রানা, ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি। 'ওই সে এসেছে, তুমি যাকে খুঁজছিলে।'

সন্ধ্যার বাকিটা সময় পরিবেশ শান্তই থাকল। সুসিনাকে নিয়ে ডাইনিং রুমে ডিনার খেয়েছে রানা, তবে শাইখ আর লিয়া খেয়েছে যে-যার কামরায় একা।

রানা ভাবছে, প্রথম চালটা কে দেবে? হলে যখন দেখা হলো দু'জনের, পরস্পরের কুশল জানবার জন্য সাকুল্যে বোধহয় দশটা শব্দও ব্যবহার করেনি তারা–লিয়া আর শাইখ।

সাইফার ফটো আর শাইখের কাছ থেকে পাওয়া লিখিত কী, এ-সব নিয়ে হোটেলে ফিরে গেছে শামিম। ধাঁধার সমাধান পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন রানারকে দিয়ে খবর পাঠাতে বলে দিয়েছে রানা, তা সে যে-সময়ই হোক।

এত গভীর চিন্তায় ডুবে আছে রানা, সুসিনা ওর গালে হাত বুলালেও টের পেল না। মেয়েটা দ্বিতীয় বার স্পর্শ করতে কফির কাপ থেকে চোখ তুলে তাকাল ও।

চেহারা ম্লান করে, চোখে কাতর ভাব এনে বিষণ্নতা ফোটাতে চাইল সুসিনা, তারপর রানার দিকে একটা আঙুল তাক করল। বলতে চাইছে–তোমার বুঝি মন খারাপ?

'না, মন খারাপ নয়,' উত্তরে বলল রানা। 'একটু চিন্তিত।'

একটু ঝুঁকে রানার একটা হাত ধরল সুসিনা। তার মুখ সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

কিছু বলতে যাবে রানা, দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল রাইসুল।

'কী খবর?'

'শামিম।'

'চলো।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রানা, তাকিয়ে আছে সুসিনার দিকে। 'কাল, সুসিনা, রাইসুলের দু'জন লোক প্লেনে করে জেনেভায় নিয়ে যাবে তোমাকে। ওখানে একটা হসপিটাল আছে, আর আছে কলেজ। জীবনে আর কখনও টাকার অভাব হবে না তোমার। ওখানে লোকজন আছে, যখন যা দরকার তোমার চাইলেই সব পাবে।'

বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকল সুসিনা, রানার মনে হলো তার চোখের পাতায় পানি জমছে।

'রাতে খুব ভাল একটা ঘুম দাও।' সুসিনার একটা হাত ধরল রানা, তারপর ছেড়ে দিল। 'চলো, রাইসুল।'

দশ মিনিটের মধ্যে রাইসুলের থ্রি স্টারে পৌঁছে গেল ওরা। একবার নক করতেই দরজা খুলে দিল শামিম। ওদেরকে দেখে এক পাশে সরে দাঁড়াল সে।

জানালার কাছাকাছি একটা চেয়ারে বসে বাইরে চোখ রাখল রাইসুল।

'যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে কঠিন লাগল কাজটা,' বলল শামিম। 'ফিলিস্তিনি ভদ্রলোক, মিস্টার সামি কাদরি, পথে পথে ছোটখাট সব ফাঁদ পেতে রেখে গেছেন।'

'ইজরায়েলিদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালাবার সময় তাঁর যদি কিছু ঘটে, সম্ভবত এরকম একটা আশঙ্কা থেকেই সাইফার কী সিস্টেম সেট করেছিলেন তিনি,' মন্তব্য করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল শামিম। 'এরকম আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণও ছিল। সে যাই হোক, সাইফারটা আমি বোধহয় ভাঙতে পেরেছি।'

ধীরে ধীরে, সাবধানে, স্পেন আর পর্তুগালের একটা ম্যাপের ভাঁজ খুলল সে। তার নোটগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে নাগালের মধ্যে রাখল, তারপর একটা চেয়ারে বসে বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল।

'সাইফার ভেঙে আমি যখন কবরস্থানের নামটা বের করি–আওয়ার লেডি অভ দা ব্লিডিং হার্ট–তখন উল্কিটায় খ্রিস্টান সিম্বল দেখে ওগুলোর ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলাম। কিন্তু আসলে ওগুলো স্রেফ একটা মুখোশ, একটা ফলস ট্রেইল।'

'কী রকম?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দেখা যাচ্ছে, মিস্টার শাইখ যে কী বা চাবি দিয়েছেন সেগুলো আমাদেরকে অন্যদিকে নিয়ে যেতে চায়। প্রচুর সময় লেগেছে আমার, নতুন দিক নির্দেশনা পাবার জন্যে আবার উল্কির ফটোতে ফিরে যেতে হয়েছে, তারপর যে 'কী' পেয়েছি সেটা মোটেও খ্রিস্টান নয়–মুসলিম।'

সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, দৃষ্টি ছুটোছুটি করছে ম্যাপের বৃত্ত আঁকা লোকেশনের উপর। 'ওটা কি কবরস্থানের লোকেশন?'

'হ্যাঁ, জেল্‌ব্।'

'কী?'

'জেল্‌ব্। এটা পর্তুগালের দক্ষিণে মুরিশ সংস্কৃতির একটা পীঠ বা তীর্থস্থান ছিল, পরে দখল করে নেয় ক্রুসেডাররা...'

'তারপর নাম দেয় সিলভেস,' বিড় বিড় করল রানা, ওর ডান হাতের তর্জনী পর্তুগালের উপর দিয়ে ঘষা খেয়ে পাহাড়ি গ্রাম আলগারেভের কাছে এসে থামল।

মাথা ঝাঁকাল শামিম। 'আপনি চেনেন, মাসুদ ভাই?'

'চিনি, তবে খুব ভাল করে নয়। ওদিকে একটা সেমিট্রি বা কবরস্থান আছে বটে, রাস্তার ধারে, জায়গাটাকে বোধহয় লাগুয়া বলে–তবে সেটার নাম আওয়ার লেডি অভ দা ব্লিডিং হার্ট নয়।'

'না, নয়,' বলল শামিম। 'কী–জেল্‌ব্ পাওয়ার পর–প্রাচীন ইতিহাসের খোঁজে রীতিমত গবেষণা করতে হয়েছে আমাকে। আপনি সিলভেস দুর্গের কথা জানেন, মাসুদ ভাই?'

'জানি।'

'জানবার তো কথাই,' হাসি চেপে বলল শামিম। 'তবে

আপনি যেমন বলেছেন, খুব ভাল করে চেনেন না।'

এরপর ব্রিফকেসে হাত ভরে বড় একটা কাগজ বের করল শামিম, ম্যাপের উপর রেখে ভাঁজ খুলল সেটার। 'এটা হলো থিসিসের প্রয়োজনে এক ভার্সিটি ছাত্রের আঁকা আর্কিটেকচারাল নকশা...'

'সিলভেস দুর্গের?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে দেখছি অনেক খাটতে হয়েছে।'

'জেল্ব্, অর্থাৎ প্রাইম লোকেশন পাবার পর, প্রতিটি অ্যাভিনিউ চেক করি আমি। দুর্গটা নবম শতাব্দীর কীর্তি। না বললেও চলে যে ওটার বহু কিছু বদলে ফেলা হয়েছে। দেয়ালগুলোর ভেতর বিরাট সব বাগান তৈরি করেছে সরকার, ব্যবসায়ীদের সুযোগ দিয়েছে দোকান-পাট বসিয়ে ব্যবসা করার।

'এই টাওয়ারগুলো দেখছেন? এগুলো এক সময় মসজিদের মিনার ছিল। সব ভেঙে ফেলা হয়েছে। গত প্রায় দুশো বছর হাত দেয়া হয়নি শুধু উঠানের নীচের টানেল আর আন্ডারগ্রাউন্ড জেলখানায়। ক্রুসেডাররা হামলা করলে মুররা ওখানে লুকাত।'

ব্রিফকেস থেকে আরও একটা ড্রইং বের করল শামিম।

'বছর কয়েক আগে আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারে কিছু খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করা হয়। ব্যক্তিগত জিনিস্-পত্র সহ কিছু কবর পাওয়া যায়। ক্রুসেডারদের কবর দেয়া হয়েছিল ওখানে, যারা দুর্গ দখল করতে এসে মারা যায়।'

'আওয়ার লেডি অভ দা ব্লিডিং হার্ট?'

'হ্যাঁ। আমার অনুমান, সামি কাদরি শুধু সাংবাদিক নন; সৌখিন একজন আর্কিওলজিস্টও ছিলেন। এ-সব কবরের প্রতিটির সঙ্গে যে জিনিসটি ছিল এখন সেটিকে আমরা সেফ বলব, তৈরি করা হয় ক্রস-এ, কিংবা কবরের গোড়ায়...আসলে ছোট কুলঙ্গি, তবে লাশের ব্যক্তিগত জিনিস রাখবার মত যথেষ্ট গভীর।

'শাইখের দেয়া কী-র অংশবিশেষ থেকে সহজবোধ্য কিছু দিক-নির্দেশনা পেয়েছি আমি, যার সাহায্যে এরকম একটা প্রাচীন সেফ পাওয়া যাবে আর খোলা যাবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ব্যাপারটা মেলে। আমাদের অ্যাথেন্স শাখার প্রধান আকাশ মিস্টার সামি কাদরি সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছে। আমরা জানি, সোহানার সঙ্গে তিনি দেখা করেন গ্রিসে এসে। সে সময় তিনি তাঁর পত্রিকার প্রতিনিধি হয়ে বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ায় দায়িত্ব পালন করছিলেন।

'আকাশ খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছে, লিসবনে একজন নাৎসী কর্মকর্তা গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মহত্যা করায় খবরটা কাভার করার জন্যে পত্রিকার সম্পাদক কাদরিকে সেখানে যেতে বলেছিলেন। ওখানে যাবার পথেই গ্রিসে থামেন তিনি।'

'লিসবন-সিলভেস-লিসবন, গাড়ি-পথে তিন ঘণ্টার জার্নি,' বলল শামিম। 'শেডিউল টাইট হলেও সময় বের করা সম্ভব।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তবে অনেক দিন আগের কথা। তোমার মনে হয়, এখন আর কিছু পাওয়া যাবে?'

'আমার ধারণা, যাবে। জিনিসটা লুকাবার জন্যে যিনি এত কষ্ট করেছেন, কাগজগুলো নিশ্চয়ই তিনি মাইক্রোফিল্ম করে রেখেছেন।'

'তা তো রেখেছেনই।'

'আর সেই মাইক্রোফিল্ম আছেও নিশ্চয় কোন এয়ারটাইট স্টিল ক্যানিস্টারে।'

রানার চোখে গভীর দৃষ্টি। 'তুমি জোর দিয়ে বলছ, ওগুলো খুঁজে বের করার চাবি তোমার কাছে আছে?'

'জোর দিয়ে বলছি, খুঁজে পাবার সম্ভাবনা শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ।'

'প্রভাতি কপি করতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকাল শামিম। 'অতিরিক্ত কিছু ইকুইপমেন্ট লাগবে

ওর, আশা করা যায় কাছাকাছি বড় শহর পোর্টিমাও-এ পাওয়া যাবে সব।'

'বুঝেছি।' হাতঘড়ি দেখল রানা, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে রাইসুলের দিকে তাকাল। 'কী করা যায়?'

এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে রাইসুল। 'কয়েকটা ফোন করে দেখি। এখনই ফিরব।'

রানা আর শামিম আবার ঝুঁকে পড়ল ম্যাপ আর নকশার উপর।

'ব্রিটিশ পাসপোর্ট আছে তোমাদের, কাজেই ওখানে যেতে ভিসা লাগছে না,' শামিমকে বলল রানা। 'অন্যান্য কাগজ-পত্র যা লাগবে সবই যোগাড় করা যাবে। কিন্তু তারপরও কাজটা তোমাদেরকে করতে হবে অত্যন্ত দ্রুত। আর, কেন যাচ্ছ তা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কাউকে বুঝতে দেয়া যাবে না।'

'লিসবন ইউনিভার্সিটির কিছু লোককে আমি চিনি, তারা আমাকে একটা কাভার নিতে সাহায্য করবে।'

দ্রুত কথা বলে গেল রানা, মাথায় যেভাবে আসছে সেভাবেই একটা প্ল্যান-এর খুঁটিনাটি সমস্ত দিক ব্যাখ্যা করছে। শামিমের বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন আর মন্তব্য শুনে, চোখের চকচকে ভাব দেখে বুঝতে পারল প্রতিটি সূক্ষ্ম পয়েন্টের মর্ম অনুধাবন করতে পারছে সে।

'ঠিক আছে, এবার আমাকে বলো, সময় এলে কী করতে হবে।'

যা কিছু শুনেছে হুবহু তাই বলে গেল শামিম। সে-ও থামল, রাইসুলও ফিরে এল।

'আকাশ ওদের জন্যে একটা প্লেন চার্টার করছে,' বলল সে। 'প্লেনটা দু'ঘণ্টা পর অ্যাথেন্স এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হবে।'

'ফ্লাইং টাইম জানো? পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে?'

'কম বেশি পাঁচ ঘণ্টা।'

শামিমের দিকে ফিরল রানা। 'সময়ের ব্যবধান দু'ঘণ্টা।

লিসবন এয়ারপোর্টে যদি একটা গাড়ি অপেক্ষা করে, ভোরের মধ্যে সিলভেসে পৌঁছে যাবে তোমরা।

'আমরা রওনা হব সকাল পামেলা কমার্শিয়াল ফ্লাইট ধরে। অর্থাৎ, নয় ঘণ্টা এগিয়ে থাকবে তোমরা। সেটা কি যথেষ্ট?'

'হ্যাঁ, যথেষ্ট।'

'গুড।' রানা কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সময় নষ্ট না করে ব্রিফকেস গুছাতে শুরু করল শামিম।

হোটেল থেকে ভিলায় ফিরে রানা দেখল, গেটে সশস্ত্র দারোয়ানের সংখ্যা বাড়িয়েছে রাইসুল। শুধু তাই নয়, আরও দু'জন গার্ড গোটা বাড়ির চারপাশে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

তিনতলায় উঠে এসে শাইখের দরজার বাইরে থামল রানা। ভিতর থেকে ছন্দবদ্ধ নিঃশ্বাসের আওয়াজ ভেসে আসছে। কবাটে মৃদু নক করল ও।

'ইয়েস?'

'রানা।'

'আসুন, সার।'

বিছানা থেকেই হাত বাড়িয়ে বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বালল শাইখ। দরজা ঠেলে দিয়ে একটা চেয়ার টেনে বিছানার কাছাকাছি বসল রানা।

দৈত্যাকার গ্রিক ক্রিমিনাল উঠে বসেছে, হাত দিয়ে রগড়ে ঘুম তাড়াচ্ছে চোখ থেকে। নিচু টেবিলের উপর হুইস্কির একটা বোতল দেখা যাচ্ছে। তবে বাতাসে শুধু মদ নয়, হালকা একটা পারফিউমের গন্ধও ভেসে বেড়াচ্ছে।

'পেয়েছি।'

'কোথায়?'

'কমার্শিয়াল ফ্লাইট ধরে কাল সকালে আমরা লিসবন যাচ্ছি।'

'লিসবন? বলেন কী!'

'লিয়ার সঙ্গে তোমার বোঝাপড়া হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল শাইখ, রানার মনে হলো মুহূর্তের জন্য সামান্য আড়ষ্ট দেখাল তাকে। 'আমি তাকে একটা পার্সেন্টেজ অফার করেছি।'

কোন মন্তব্য না করে রানা শুধু মাথা ঝাঁকাল। লিয়া ওকে জানিয়েছিল, সে আধাআধি চায়। এখন দেখা যাচ্ছে তার কমেও সে রাজি। রানার ধারণা, কারণটা ও জানে।

'মেয়েটিকে, সুসিনাকে, কাল সকালে সুইটজারল্যান্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওখানেই তার বসবাসের ব্যবস্থা করা হবে।'

'এটা, সার, আপনি একটা অনেক বড় পুণ্যের কাজ করছেন। যদি বলেন তো আমি আমার শেয়ার থেকে ওর জন্যে কিছু খরচপাতি করতে রাজি আছি।'

'সেটা তোমার ব্যাপার,' বলল রানা। 'সকালে আমরা যখন অ্যাথেন্সে পৌঁছাব, ততক্ষণে আমার এজেন্সির লোকজন তোমার জন্যে কিছু ভুয়া কাগজ-পত্র তৈরি করে রাখবে। পর্তুগালে আমরা যদি মাইক্রোফিল্ম পাই, ওখানেই তোমার পাওনা টাকা পরিশোধ করা হবে। তারপর থেকে তোমার পথ তুমি দেখবে, আমাদেরটা আমরা। ঠিক আছে?'

'জী, সার, ঠিক আছে।'

'জানো নিশ্চয়, যে-টাকা তুমি চাইছ তার সঙ্গে ডাকাতির কোন পার্থক্য নেই?'

প্রকাণ্ড মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল শাইখ। হাসি থামতে বলল সে। 'যে জিনিসটা পেতে যাচ্ছেন তার দাম নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশি, তা না হলে এত টাকা আমাকে আপনারা দিতেন না।' তারপর গাঢ় চোখ দুটো সরু করল, 'ডাকাত আবদালকে আপনারা ঠকাবার মতলব করছেন না তো, সার?'

দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল

'মাইক্রোফিল্ম পেলে কেন ঠকাব?'

হল ধরে হেঁটে এসে নিজের কামরায় ঢুকল রানা। আলো না জ্বেলে অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ও। প্রায় দশ মিনিট পর বাইরের হল থেকে স্লিপার পরা পায়ের নরম শব্দ ভেসে এল। পা দুটো একবার থামল, তারপর হল ধরে চলে গেল।

পায়ের জুতো খুলে দরজাটা এক ইঞ্চি ফাঁক করল রানা। দেখল শাইখের কামরায় ঢুকছে লিয়া।

দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা। তারপর হলে বেরিয়ে, নিঃশব্দ পায়ে চলে এল শাইখের দরজার সামনে।

একটু চাপ দিতেই শাইখের দরজার কবাট আধ ইঞ্চি ফাঁক হলো। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকেছে কামরার ভিতর। লিয়া আর শাইখকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা।

'কিন্তু আমাকে তোমার সঙ্গে নিতেই হবে, আবদাল। তুমি নিজেই আমাকে বলেছ, ওকে তুমি বিশ্বাস করো না। তোমার মাথার পিছনে একজোড়া চোখ হতে পারি আমি।'

'বলেছি তো, তোমার ভাগের টাকা তুমি ঠিকই পাবে।'

'আমি শুধু টাকার কথা ভাবছি না, আবদাল। আমি আমাদের কথা ভাবছি...ব্যাপারটা তোমারও এখন বোঝা উচিত।'

গায়ে জড়ানো রোবটা ছেড়ে দিল লিয়া। রোবের নীচে আর কিছু পরেনি। এক টানে শাইখের গা থেকে চাদরটা টেনে নিল সে, তারপর আক্ষরিক অর্থেই তার উপর চড়াও হলো। 'আমরা দু'জন মিলে এখন একটা দল, আবদাল। তোমার জীবনে আমি একটা আশীর্বাদ হয়ে এসেছি।'

শাইখ ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে বলল, 'কী জানি! এই মুহূর্তে তোমাকে আমি রাক্ষসী ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছি না।'

এরপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজের কামরায় ফিরে এল রানা।

প্রায় এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। রানার চোখে ঘুম। হালকা নকের শব্দে ছুটে গেল সেটা।

'সার?' শাইখের গলা।

'বলো।'

'দয়া করে দরজাটা যদি একটু খুলতেন।'

আলো না জ্বেলেই দরজা খুলল রানা। 'কী চাই?'

'সার,' দরজার বাইরে থেকে বলল শাইখ, 'আমাদের সঙ্গে লিয়াও পর্তুগালে যাবে।'

অন্ধকারে হাসল রানা। 'আমিও তাই ভেবেছি।'

'ও, তাই? তা'হলে তো ভালই। গুড নাইট, সার।'

'গুড নাইট, শাইখ।'

বারো

মাইলোস ফ্লাইট ধরে অ্যাথেন্সে এসে মাত্র আধঘণ্টা সময় পাচ্ছে ওরা, তারপরই চড়তে হবে লিসবনগামী প্লেনে।

দশ মিনিট পার হয়ে গেছে, এই সময় পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে প্রচার হলো: 'মিস্টার রানা, মিস্টার মাসুদ রানা, দয়া করে কাছাকাছি মেগা ফোনটা ধরুন।'

অপরপ্রান্তে আকাশ। জিজ্ঞেস করল, 'প্যাকেজটা পেয়েছেন, মাসুদ ভাই?'

'হ্যাঁ, এক পোর্টার দিল। আমি এরইমধ্যে সেটা শাইখকে দিয়েছি, সে বাধা টপকে ডিপারচার লাউঞ্জে পৌঁছেও গেছে।

তোমার লোকজনকে বলো, ওরা সরকারের চেয়েও দ্রুত পাসপোর্ট বানায়।'

'কীভাবে কী করতে হয় জানা থাকলে ব্যাপারটা পানির মত সহজ।' হাসল আকাশ। 'মাসুদ ভাই, আমরা ময়নিহানকে আটক করেছি।'

রানার শিরদাঁড়ায় শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো। 'ভেরি গুড। বলে যাও।'

'জোসেফ ময়নিহান, বয়স ছত্রিশ, তেরো বছর ধরে মোসাদ এজেন্ট। মিশর, ইরাক, সুদান আর বুলগেরিয়ায় দায়িত্ব পালন করেছে। লোকটা স্বয়ং আবু মুসার প্রশ্রয় আর পৃষ্ঠপোষকতা পায়।'

'ওহ্, গড! আবু মুসা এখন মোসাদের ডেপুটি চিফ! মিস্টার কাদরি সোহামাকে এই লোকেরই নাম বলেছিলেন।'

'জী, মাসুদ ভাই। আবু মুসা সহ মোট আটজন মোসাদ আফিসারের নামে সুইস ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে।'

'তাকে তোমরা ইন্টারোগেট করছ?'

'তার দরকার হয়নি, মাসুদ ভাই। জিজ্ঞেস না করতেই পেট থেকে সব বের করে দিয়েছে।'

'কী বলছে সে?'

'একদল তরুণ মোসাদ অফিসার আবু মুসা সহ আটজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছিল। তাদের মুখ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করা হয় টাকা দিয়ে। কিন্তু কয়েক বছর পর ব্যাপারটা নিয়ে আবার তোলপাড় শুরু হয়। আবু মুসা খবর পায়, তরুণ অফিসারদের একজন টাকা খাওয়া সত্ত্বেও মুখ খুলেছে। মুখ খুলেছে আরও একজন–মিস্টার সামি কাদরির দ্বিতীয় স্ত্রী–পামেলা।

'তা হলে পামেলাকে যখন ট্রেনিং দিয়ে গ্রিসে পাঠানো হলো, আবু মুসা বুঝল এবার তার কিছু না করলেই নয়।'

'জী। পামেলার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দেয়া হয় ময়নিহানকে। তার ওপর আগে থেকেই নজর রাখছিল সে। তারপর তেল আবিব থেকে খবর এল, মিসেস কাদরিকে মাইক্রোফিল্মটা উদ্ধার করার অ্যাসাইনমেন্ট দেয়া হয়েছে।'

'ব্যস, টিম নিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ময়নিহান, কিন্তু আমি বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় সুবিধে করতে পারেনি তারা।'

'জী। তখনই ওরা আপনাকে শুধু ফলো করার জন্যে দু'জন স্থানীয় ছোকরাকে ভাড়া করে।'

'সেই রাতে টিমকে ময়নিহান ঠিক কী নির্দেশ দিয়েছিল?'

'প্রথমে পামেলাকে পথ থেকে সরাও, যাতে তার লিঙ্ক কেটে যায়। তারপর মাসুদ রানাকে মাইক্রোফিল্মটা উদ্ধার করার সময় দাও।'

'আমি পেলে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে?'

'হ্যাঁ।'

'পামেলা এখন কী করছে?'

'শাইখকে ছেড়ে টয়লেটে ঢুকেছে।'

'টয়লেটে ফোন নেই তো?'

'আছে, মাসুদ ভাই।'

'এবং?' জিজ্ঞেস করল রানা, উত্তরটা এরইমধ্যে আন্দাজ করতে পারছে।

'এয়ারপোর্টে যতগুলো উওম্যান রেস্ট রুম আছে, সবগুলোর ফোনে আড়ি পাতছি আমরা।'

'কোন খবর থাকলে আমাকে জানিয়ো।'

'জী, মাসুদ ভাই।'

ডিপারচার লাউঞ্জে এসে রানা দেখল ইতিমধ্যে টয়লেট থেকে ফিরে শাইখের পাশে সোফায় বসে রয়েছে লিয়া। তার চোখে-মুখে শান্ত একটা উৎফুল্ল ভাব লক্ষ করল ও।

'কোন সমস্যা?' জানতে চাইল শাইখ।

'না। মাইলোস ফ্লাইটের টিকিট কাটা হয়েছিল ক্রেডিট কার্ড দিয়ে, ওরা ওটার নাম্বার গোলমাল করে ফেলায় ঝামেলা দেখা দিয়েছিল।'

নিজের টিকিট পরীক্ষা করবার ছলে চোরা চোখে লিয়ার দিকে তাকাল রানা। এই জগতেই নেই সে।

'ওই আমাদের ফ্লাইট। চলো।'

ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট ওদের। সিটে বসে হেলান দিল শাইখ, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে বলল, 'সারের সঙ্গে চলাফেরা করলে এই একটা মজা—স্টাইল আর আরামের কোন কমতি নেই।'

আইলের ওদিকের সিটে চোখ বুজে বসে আছে রানা, কোন মন্তব্য করল না।

প্লেন আকাশে উঠবার পর এক চোখ খুলে রানা দেখল, লিয়া আর শাইখের মাথা দুটো এক হয়ে আছে। দু'জনের হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস, নিচু গলায় কথা বলছে।

কী বলছে রানা তা শুনবার চেষ্টা করল না।

ফার্স্ট ক্লাসে ওরা তিনজন ছাড়া আর মাত্র একজন আরোহী রয়েছে। ছোটখাট এক বুড়ি। প্লেন আকাশে উঠবার আগেই তাকে রানা বিবেচনার বাইরে রেখেছে।

একজন ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্ট ট্যুরিস্ট আর ফার্স্ট ক্লাসের মাঝখানের পরদাটা সরিয়ে দিল। বাধ্য হয়ে দু'চোখ মেলতে হলো রানাকে।

ট্যুরিস্ট সেকশনের একেবারে পিছন দিকটায় দু'জন লোককে বাছাই করল ওর চোখ। দু'জন আইলের দু'দিকে, যথেষ্ট ব্যবধান রেখে বসেছে, তাসত্ত্বেও সহজেই ধরা পড়ল তারা। দু'জনেই মোসাদের রিক্রুটিং পোস্টারের জন্য পোজ দিতে পারে।

ক্যাপটেন এয়ারপোর্টের নাম ঘোষণা করল—পোর্টেলা দ্য সাকাভেম। লিসবনের বাইরে ওটা।

কাস্টমসের ঝামেলা শেষ হতে শাইখ আর লিয়াকে ব্যাগগুলো

নিয়ে আসবার দায়িত্ব দিয়ে রানা বলল, 'আমি একটা রেন্টাল কারের ব্যবস্থা করি।'

'সার?' পিছন থেকে ডেকে রানাকে থামিয়ে দিল শাইখ।

'ইয়েস?'

'আমরা কোথায় যাচ্ছি? এখন বোধহয় আমাদেরকে বলবার সময় হয়েছে।'

'তা হয়তো হয়েছে,' বলল রানা, আবার রওনা হয়ে কথা বলছে কাঁধের উপর দিয়ে। 'যাচ্ছি দক্ষিণে...সিলভেসে।'

সারি সারি রেন্টাল কার কাউন্টারেব দিকে এগোল রানা। ভিড়ের মধ্যে মিশে, মিছিলের সঙ্গে বেরিয়ে এল অ্যারাইভাল লাউঞ্জ থেকে। আড়ালে দাঁড়াল, কাঁচের ভিতর দিয়ে লিয়া আর শাইখকে দেখছে। তারা দু'জন এখনও সচল বেল্টের পাশে বসে আছে।

প্লেনে যাদেরকে দেখেছিল তারাও রয়েছে ওখানে, তবে পরস্পরের কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে। মাঝেমধ্যেই দৃষ্টি বিনিময় করছে তারা, লিয়ার দিকেও তাকাচ্ছে।

চিন্তা করছে রানা। গন্তব্যে পৌঁছানোর পর ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটা কিছু দরকার হবে লিয়ার। অর্থাৎ একটা আগ্নেয়াস্ত্র। সেটা তার হাতে তুলে দেওয়ার সবচেয়ে ভাল জায়গা তো এই এয়ারপোর্টই।

কিন্তু কাজটা কে করবে?

চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল, লিয়া দাঁড়াচ্ছে। একটু ঝুঁকল সে, কী যেন বলল শাইখকে, হালকা একটা চুমো খেল ঠোঁটে, তারপর সরে এসে মিশে গেল মানুষের ভিড়ে।

লিয়ার সম্ভাব্য পথটা খুঁজে নিল রানা। তারপর দেখতে পেল তার কনট্যাক্টকে।

মধ্যবয়স্কা এক মহিলা; তেমন লম্বা নয়, তবে বেশ মোটা। গাঢ় নীল রঙের ট্র্যাভেলিং সুট পরেছে, সঙ্গে সুটকেস নেই। শুধু

কাঁধ থেকে একটা লেদার ব্যাগ ঝুলছে। বাম বগলে গোঁজা খুব আঁট করে গোল পাকানো একটা খবরের কাগজ।

দু'জন পরস্পরের দিকে শান্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে। প্রায় কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে পাশ কাটাল তারা। হু-উ-উস করে আটকে রাখা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল রানার নাক দিয়ে।

ভাল একটা কৌশল। প্রায় নিখুঁত। মহিলার ব্যাগটা তার কাঁধেই রয়েছে। নেই বগলের নীচের কাগজটা। সেটা এখন লিয়ার বগলে।

রেন্টাল কার কাউন্টারে চলে এল রানা। 'মাসুদ রানা। অ্যাথেন্স থেকে আমার নামে একটা কার রিজার্ভ করার কথা।'

'ইয়েস, সার,' বলল মেয়েটা, রানার নাম লেখা রিজার্ভেশন প্যাকেটটা ধরবার জন্য হাত লম্বা করল। বড় একটা পেপার ক্লিপের সাহায্যে ওটার সঙ্গে কী যেন একটা আটকানো রয়েছে। 'ওহ্, তার আগে এই এনভেলাপটা আপনার জন্যে রেখে যাওয়া হয়েছে।'

গাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত খুঁটিনাটি খাতায় লিখছে মেয়েটা, একপাশে সরে এসে সীল করা এনভেলাপটা ছিঁড়ে ফেলল রানা।

ভিতর থেকে বেরুল দুই শিট কমপিউটার প্রিন্টআউট।

শুরুতে কোন নোট নেই। তার প্রয়োজনও নেই। প্রিন্টআউটে একবার চোখ বুলিয়েই কী জিনিস বুঝে নিয়েছে রানা। পড়তে শুরু করবার আগে ভাবল, আকাশ সত্যি খুব কাজের ছেলে।

'এদিকে আমি জোনাকি।'

(বিরতি...যান্ত্রিক গুঞ্জন... নেপথ্যে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর।)

'কোথায় ছিলে? তুমি মাইকোনোস থেকে ফোন করার পর আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারি বোটটা রোডস্ আইল্যান্ডে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায়!'

'শুয়োরটা আমাকে বোকা বানিয়েছে। আমরা মাইলোসে ছিলাম।'

'সে কি তোমার ব্যাপারটা জানে?'

'সন্দেহ করে। করে প্রথম থেকেই, তবে নিশ্চিতভাবে কিছুই জানে না।'

'তুমি এখন কোথায়?'

'এখানে, অ্যাথেন্স এয়ারপোর্টে। আমরা লিসবনে যাচ্ছি।'

'এটা মেলে। পালাবার ঠিক আগে তোমার স্বামী লিসবনে গিয়েছিল। তোমার ফ্লাইট নম্বর কী?'

'টিডব্লিউএ ৯০০।'

'কাছাকাছি রেগুলাররা আছে। তোমার ফ্লাইটে দু'জনকে তুলে দিচ্ছি আমি। তুমি এখনও সশস্ত্র?'

'না। শুয়োরটা মাইলোসে আমার অটোমেটিক নিয়ে নিয়েছে।'

'লিসবন এয়ারপোর্টে ডাইয়্যান থাকবে। মাইক্রোফিল্ম ঠিক কোথায় আছে জানতে চেষ্টা করো। ওই বাঙালীটা ভয়ানক চালাক। তোমার পিছনে একজন অবজারভারকে রাখলেই বা কী, তাকে সে অনায়াসে ফাঁকি দেবে। শাইখকে কি ছাঁচে ফেলা যাবে?'

'(হাসি) অনায়াসে।'

'ভেরি গুড। কাজ তা হলে অনেক সহজ হয়ে যাবে। চুপিসারে মাইক্রোফিল্ম পাওয়ার জন্যে যা করার সব করবে তুমি। এমন কোন গোলমাল চাই না যাতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ছুটে আসে। তোমাকে নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই ওই মাইক্রোফিল্ম কেন আমাদের দরকার।'

'না, নেই। ওগুলোর গুরুত্ব আমিই প্রথম কর্তৃপক্ষকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। এবং সেজন্যে তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে।'

'ময়নিহান নামের ঝামেলা থেকে আমি মুক্ত?'

'হ্যাঁ। ময়নিহান আর তার দল গায়েব হয়ে গেছে। ওদের দুই লোককে আমরাই খতম করেছি—বেঈমানের দল! দুর্নীতিবাজ!

দেশদ্রোহী! বাকিরা পালিয়েছে, তবে ওদেরকে আমরা খুঁজে বার করব।'

'লিসবন থেকে যোগাযোগ করতে পারি। এখন রাখলাম।'

(নোট: আপনার দেওয়া ফোন নম্বর ট্রেস করা হয়েছে, ওটা অ্যাথেন্সের নম্বর, মোসাদের একটা সেফ হাউসের। আপনার নির্দেশ অনুসারে কোন অ্যাকশন নেওয়া হয়নি। ফোনে আলাপটা করা হয় হিব্রু ভাষায়।)

'এখানে একটা সই করুন, প্লিজ, সার।'

'ও, হ্যাঁ।'

খাতায় সই করে গাড়ির চাবি নিয়ে পকেটে ভরল রানা। তারপর রেস্টরুমে ঢুকে প্রিন্ট আউট পুড়িয়ে ফ্লাশ করল।

সচল বেল্ট থেকে ইতিমধ্যে ব্যাগগুলো সংগ্রহ করেছে শাইখ। 'রেডি, সার?'

মাথা ঝাঁকাল রানা, পথ দেখিয়ে ওদেরকে রেন্টাল কার পার্কিং এরিয়ায় নিয়ে এল।

গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে আসবার সময় পিছনে একটা লাল ফিয়াটকে দেখল রানা, ড্রাইভিং সিটে মোটাসোটা এক মহিলা। লিসবনে ঢুকবার সময়ও পিছনে থাকল ওটা, তবে অনেকটা দূরে।

আপন মনে হাসল রানা।

মহিলা, সম্ভবত ডাইয়্যান, খুব কাছ থেকে ওদেরকে অনুসরণ করবে না। তার আসলে কোন প্রয়োজন নেই। ইতিমধ্যে জানে সে কোথায় যাচ্ছে ওরা।

তেরো

লাল স্যান্ডস্টোন দিয়ে তৈরি কেল্লার সবচেয়ে উঁচু টাওয়ারটার গায়ে হেলান দিয়ে নীচে তাকাল রানা; সবুজ শেওলা ধরা সারি সারি টালির ছাদ আর পাথরে বাঁধানো সিলভেস শহরের সরু আঁকাবাঁকা রাস্তা দেখছে।

রাজধানী লিসবন থেকে ইনল্যান্ড হাইওয়ে ধরে এখানে পৌঁছাতে পুরোপুরি তিন ঘণ্টা সময় লেগেছে। নিজেদের মধ্যে তেমন কোন কথা হয়নি, শুধু একবার শাইখ জানতে চেয়েছে: 'মাইক্রোফিল্মটা পাবার পর, বাকি অর্ধেক টাকা আমি কীভাবে পাব?'

'সিলভেস থেকে গাড়ি নিয়ে ফারো-য় যাব আমরা। এয়ারপোর্টটা ওখানে। রাত কাটাতে হবে হোটেলে। সুইস ব্যাঙ্ক তখন বন্ধ থাকবে।

'সকালে আমার প্রথম কাজ হবে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করা। ওরা জেনেভায় ফ্যাক্স বা টেলেক্স পাঠাবে। তারপর ফারো থেকে তুমি ফোন করবে। তুমি তোমার ব্যাঙ্ক কার্ডের নম্বর ব্যবহার করবে, ওখান থেকে ওরা জানাবে ওই নম্বরে টাকাটা জমা পড়েছে। ব্যস, আমরা যে যার আলাদা পথ ধরব।'

চট করে দৃষ্টি বিনিময় করল শাইখ আর লিয়া। গ্রিক ক্রিমিনাল খানিক চিন্তা করবার পর বলল, 'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হলো না।'

'এর মধ্যে পছন্দ না হবার কী আছে?'

'রাতটুকু হোটেলে কাটাতে হবে, ওই সময় মাইক্রোফিল্ম থাকবে আপনার কাছে।'

'সত্যিই অন্যায়,' বিদ্রূপ করল রানা।

বাকি পথ আর কোন কথা হয়নি, তবে গাড়ির ভিতর টান-টান উত্তেজনা থাকল সারাক্ষণই।

টাওয়ারের মাথা থেকে একটা কবুতর এসে নামল রানার পায়ের কাছে। ওটাকে লক্ষ্য করে দেশলাইয়ের একটা কাঠি ছুঁড়ল রানা।

পাখিটা চমকায়নি।

শাইখের সঙ্গে মিল আছে, ভাবল রানা। চোখ নামিয়ে কেল্লার উঠান আর বাগানগুলোর দিকে তাকাল ও।

ছোট একটা ফোয়ারার পাশে বসে রয়েছে শাইক। দেহটা যত বড়ই হোক, ক্লান্ত এক বুড়ো গ্রিকের মতই লাগছে তাকে। লোহার গ্রিল লাগানো দরজার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখে কোন পলক নেই। গেটটা উঠানের একেবারে শেষ মাথায়, ঝোপ আর লতা-পাতায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে।

শাইখের বাম দিকে ছোট একটা রেস্তোরাঁ, প্রায় আধ ঘণ্টা হলো ওখানে বসে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে লিয়া।

কেল্লায় ঢুকবার একটু পরই ওদেরকে ব্রিফ করেছে রানা। তার আগে ওই দরজা, ওটার তালা, যে কৌশল ব্যবহার করা হবে, সব চেক করে দেখেছে।

হাতঘড়িতে সময় দেখল রানা: চারটে পঁয়তাল্লিশ।

ট্যুরিস্টদের ভিড় এখন নেই বললেই চলে। এদিক সেদিক হেঁটে বেড়াচ্ছে আর মাত্র অল্প ক'জন লোক। মিনিট পনেরো পর বন্ধ হয়ে যাবে কেল্লা। ইউনিফর্ম পরা গার্ডরা এরই মধ্যে গেটকিপারের কামরা থেকে বেরিয়ে আসছে দর্শকদের তাগাদা দেওয়ার জন্য।

নীচের রাস্তায় তাকাল রানা। দেখতে না পেলেও জানে, ওখানে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে তারা: মোটা মহিলা, প্লেন থেকে নামা দু'জন সন্দেহভাজন মোসাদ এজেন্ট, আর সম্ভবত দুই লোককে নিয়ে আরেকটা টিম।

এখানে পৌঁছানোর পর থেকে লিয়া কারও সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করেনি তা করবে বলে রানা ধরেও নেয়নি। লিয়া মুভ করবে সময় হলে, এবং তখন তাকে সাহায্য করবার জন্য তারা সেখানে থাকবে।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল রানা, উঠান ধরে এগোচ্ছে। চোখের কোণ দিয়ে দেখল সিধে হয়ে ওর পিছু নিল শাইখ। কয়েক সেকেন্ড পর রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল লিয়া, শাইখের সঙ্গে একটা সমান্তরাল রেখা ধরে হাঁটছে।

গ্রিল লাগানো দরজার দিকে তিনটে ধাপ নেমে গেছে। ঝোপের ভিতর দিয়ে হন হন করে এগিয়ে আসছে রানা, জ্যাকেটের পকেট থেকে এক সেট লকপিক বের করল।

প্রকাণ্ড প্যাডলকটা এড়িয়ে গেল রানা, ওটা ট্যুরিস্টদের বোকা বানাবার জন্য। আসলটা ভিতরে, গ্রিলের একটা বার-এ লাগানো কবজাকে পাকা মেঝের সঙ্গে জোড়া লাগিয়েছে।

দ্বিতীয় পিকটা কাজে লাগল। 'হয়েছে,' ফিসফিস করল রানা, দরজা ঠেলে স্যাৎ করে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

শাইখ আর লিয়াও ঢুকল। দরজাটা ভিতর থেকে আবার বন্ধ করে পেনসিল টর্চ জ্বালল রানা, ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলল।

সিঁড়িটা পাথরের। দেয়ালগুলোও তাই। ক্ষতবিক্ষত চেহারা, পড়ো পড়ো অবস্থা। যত নামছে ওরা ততই সরু আর খাড়া হয়ে উঠছে ধাপগুলো। পেঁচানো সিঁড়ি, এক এক করে পাঁচ পাক ঘুরল ওরা।

অবশেষে ছোট একটা মাটির ঘরে পৌঁছাল।

'এটা একটা অ্যান্টিচেম্বার। আরেকটা দরজা আছে, ওদিকের

দেয়ালে।'

'শালার কাণ্ড!' হিসহিস করে উঠল শাইখ। 'ফিলিস্তিনি সাংবাদিক কেরামতি কিছু কম দেখাননি, এক উক্তিতে এত কিছু?'

রানা আর বলল না যে এখন ওদেরকে শায়লার উক্তি দিক নির্দেশনা দিচ্ছে না, পথ দেখাচ্ছে এক ভার্সিটি ছাত্রের ফ্লোর প্ল্যান।

দ্বিতীয় দরজাটাও প্রায় প্রথমটার মত, খুলতে একই সময় লাগল। এটা খুলে রেখে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামছে রানা। এবার দু'পাক ঘুরতেই সরু একটা প্যাসেজওয়ে পাওয়া গেল।

তিন মিনিট পর কয়েকটা টানেল হয়ে একটা বড়সড় চেম্বারে পৌঁছাল রানা। 'কোথাও আলো আছে। নড়বে না।'

পাথুরে খিলানের গায়ে পেনসিল টর্চের আলো ফেলতে সুইচ-বোর্ডটা দেখা গেল। দুটো সুইচ; একটা কামরার জন্য, আরেকটা ওদের পিছনের টানেলের জন্য।

আলো জ্বালবার পর লিয়া বলল, 'এটা এক ধরনের পবিত্র স্থান, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওপরের কেল্লাটা দখল করে নেয়ার পর এই সব টানেলে নেমে এসে লুকিয়ে থাকা মুসলমানদের হত্যা করে ক্রুসেডাররা। সেই যুদ্ধে তাদের যারা মারা গিয়েছিল, এখানে কবর দেয়া হয়। তাই এই জায়গার নাম আওয়ার লেডি অভ দা ব্লিডিং হার্ট।'

'কিন্তু মাইক্রোফিল্ম কোথায়?' জিজ্ঞেস করল লিয়া, অস্থিরতা চেপে রাখবার কোন চেষ্টা করছে না।

'দেখতে পাবে।'

কামরার মাঝখানে সরে এসে শ্রাইন বা পবিত্র স্থানটির দিকে তাকাল রানা, শামিম হায়দারের দেওয়া তথ্যগুলো স্মরণ করছে।

ভিত হিসাবে রয়েছে চারটে মার্বেল পাথর। নীচের পাথরটা বারো ফুট লম্বা আর ন'ফুট চওড়া, দেখে মনে হলো পাথুরে

মেঝেতে গভীরভাবে গাঁথা। বাকি তিনটে ক্রমশ ছোট হয়ে এসেছে, সবচেয়ে উপরেরটা তিন ফুট লম্বা আর দু'ফুট চওড়া, প্রায় ইঞ্চি দশেক পুরু।

ভোঁতা চেহারার লোহার ক্রস তিনটে। একটা উপরের মার্বেলে গাঁথা, লম্বায় রানার সমান। বাকি দুটো বড় মার্বেলটার ডান আর বাম দিকে।

বড় ক্রসটার বাহু ধরে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরাল রানা। প্রথমে মনে হলো, জিনিসটা নড়ানো সম্ভব নয়। তবে ধীরে ধীরে চাপ আরও বাড়াতে একটু একটু করে ঘুরতে শুরু করল ওটা। আধপাক ঘুরিয়ে থামল রানা। হাঁপিয়ে গেছে ও, কপালে চিক চিকে ঘাম। 'এবার ছোট ক্রস দুটো।'

ওগুলো ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে ঘোরাল রানা।

'মাশাল্লা!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল শাইখ। 'এ তো মনে হচ্ছে ভল্ট!'

'ভল্টই তো,' বলে হাতের পেনসিল টর্চ লিয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। 'ধরো এটা।'

বগলের কাছে থেকে ছুরিটা তালুতে নিয়ে এল রানা, তারপর বড় ক্রসটার মোটা দিকটায় আলো তাক করতে বলল লিয়াকে। ডেবে যাওয়া অংশটা আঙুল দিয়ে অনুভব করল ও। ওই জায়গার ঠিক মাঝখানে গাঁথতে হলো ছুরির ডগা। এক বর্গইঞ্চি আকারের একটা লোহার টুকরো উন্মুক্ত হলো।

'কী ওটা?' জানতে চাইল শাইখ।

'কবজা,' জবাব দিল রানা। 'এবার অপর দিকটা।'

পদ্ধতিটা পুনরাবৃত্তি করা হলো।

আরও দশ মিনিট খাটাখাটনির পর বড় ক্রসের একটা বাহু নীচে নামানো সম্ভব হলো। বড় মার্বেলটা স্থানচ্যুত হয়েছে, বেরিয়ে পড়েছে একটা অগভীর গর্ত।

গর্তটার ভিতর হাত গলিয়ে একটা খোপ পেল রানা। আঙুলে

কী যেন ঠেকল। সাবধানে বের করে আনবার পর সবাই দেখল ওটা একটা ক্রোমিয়াম ক্যানিস্টার। ছ'ইঞ্চি উঁচু, ডায়ামিটারে তিন ইঞ্চি।

'এটাই?' জিজ্ঞেস করল লিয়া, প্রবল উত্তেজনা চেপে রাখতে পারল না।

'এটাই,' বলল রানা। 'এয়ারটাইট ক্রোমিয়াম ক্যানিস্টার। এর ভেতরই মাইক্রোফিল্মটা আছে।'

'মানছি এরচেয়ে ভাল লুকাবার জায়গা হয় না,' বিড় বিড় করল শাইখ।

'সত্যি তাই,' বলল রানা। 'অনেক আগেই তল্লাশি চালিয়ে এটার ভেতর থেকে দামী স্মৃতিচিহ্নগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। খালি, তাই পাথর সরিয়ে এখানে কারও হাত দেয়ার সম্ভাবনা নেই, এ-কথা ভেবেই মিস্টার কাদরি এটাকে বেছে নেন।'

'কিন্তু এই জায়গার কথা তিনি জানলেন কীভাবে?' জানতে চাইল শাইখ।

চোখ ঘুরিয়ে লিয়ার দিকে তাকাল রানা। 'জবাবটা তুমি কেন দিচ্ছ না, পামেলা? এই জায়গার কথা তোমার স্বামী কীভাবে জেনেছিলেন?'

চোদ্দ

পিস্তলটা আগেই বের করে স্কার্টের ভাঁজে লুকিয়ে রেখেছিল, রানার কথা শেষ হওয়া মাত্র সেটা বের করে পিছু হটল লিয়া।

ওটা একটা বেরেটা নাইন এম এম; লিয়া ধরেছেও একজন খাঁটি প্রফেশনালের মত।

'ওয়ালথারটা নাও, আবদাল,' বলল লিয়া। 'ডান বগলের কাছে হাতে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো আছে ছুরিটা, ওটাও।'

'তুমি যে এত বড় বোকা, শাইখ, আমার ধারণা ছিল না,' ফিসফিস করে বলল রানা, লোকটা এইমাত্র ওর পিস্তল আর ছুরিটা বের করে নিয়ে পিছু হটল।

'তা হলে ব্যাখ্যা করুন, এর মধ্যে বোকামিটা কোথায়। লিয়া আমাকে আপনার চেয়ে বেশি টাকা দিতে চাইছে।'

'তুমি জানো ও কে বা কি?'

'জানে,' জবাব দিল লিয়া। 'ওকে আমি সবই বলেছি। বলেছি আমার বোকা স্বামী আমার আর ইজরায়েল রাষ্ট্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করায় তেল আবিবে আমার জীবন কী রকম দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সমাজ, সবাই জানত কাদরিকে বিয়ে করার জন্যে গোপনে ধর্মান্তরিত হয়েছি আমি। যার জন্যে এত ত্যাগ স্বীকার করলাম, সে-ই যখন আমাকে ধোঁকা দিল, সমাজে আর মুখ দেখাবার উপায় ছিল না আমার। তাই গোপন ফাইলটা উদ্ধার করার জন্যে স্বেচ্ছায় আমি ইজরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে নাম লেখাই।'

'কিন্তু তোমার ফাইলে চোখ বুলানোর সুযোগ মোসাদের আবু মুসার ছিল, ফলে সে জানতে পারে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স তোমাকে ট্রেনিং দিয়ে দেশের বাইরে পাঠাচ্ছে।'

লিয়ার চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ পড়তে দেখল রানা। 'ও, আচ্ছা। আমরা জানতাম মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সে মোসাদের একজন চর ঢুকেছে, এখন বুঝতে পারছি কারা তাকে রোপণ করেছিল।'

'মিস্টার কাদরি আমাদের এজেন্টকে আবু মুসার নাম বলেছিলেন: তিনি যে সত্যি সত্যি সোনার হরিণ খুঁজে পেয়েছেন,

তার নমুনা হিসেবে। এ প্রসঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত কৌতূহল আছে, দেখো তো তুমি কিছু জানো কি না।'

'কী কৌতূহল?'

'তোমার বাবা ইজরায়েলি পররাষ্ট্র দফতরের বড় একজন কর্মকার্তা, তার চেম্বার থেকে টপ সিক্রেট একটা ফাইল চুরি হয়ে গেল, আবার সেটা ফিরেও আসল, অথচ সে কিছু টের পেল না কেন?'

'ফাইলটা চেম্বারের ওয়াল সেফে নেই দেখে বাবার আত্মা উড়ে গিয়েছিল,' বলল লিয়া। 'পরে টের পেলেন, ফাইল আবার ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি বুঝলেন, কাজটা তাঁর জামাইয়ের। আমার কথা ভেবে ব্যাপারটা চেপে যান তিনি।

'কিন্তু আমি যখন তেল আবিবে ফিরে এসে বাপকে বললাম যে কাদরি পালিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তিনি নির্দেশ দিলেন–যাও, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সেকে রিপোর্ট করো ব্যাপারটা। বাবার নাম না জড়িয়ে তাই করলাম আমি। ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করল, ট্রেনিং দিয়ে আমাকে যদি গ্রিসে পাঠানো হয়, শাইখের ওপর নজর রাখার জন্যে আর কাদরির মেয়েটাকে খুঁজে বের করার জন্যে, আমি রাজি হব কি না। বললাম, অবশ্যই।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আচ্ছা, কবে নাগাদ তুমি টের পাও যে ময়নিহানের নেতৃত্বে আবু মুসার লোকজন তোমার বিরুদ্ধে লেগেছে?'

'সেই যে সেই রাতে। আমরা ডিনার খাবার পর ওরা আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করল, মনে আছে? তার আগে কিছুই আমি টের পাইনি।'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত, তাই না?' হেসে উঠল রানা। 'নিশ্চয়ই ভয়ে তোমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে গিয়েছিল। এখানে তুমি ইজরায়েলি মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের হয়ে কাজ করতে এসেছ, অথচ তোমাদেরই মোসাদ লোক পাঠিয়ে তোমাকে খুন করার

চেষ্টা করছে!''

'ও-সবে এখন আর কিছু এসে যায় না,' বলল লিয়া। 'এই মাইক্রোফিল্মের সাহায্যে যা খুশি তাই পেতে পারি আমি।'

'যা খুশি তাই...মানে?'

লিয়ার হয়ে শাইখ জবাব দিল, 'এখানেই, সার, আপনার চেয়ে ওর প্রস্তাবটা ভাল। হ্যাঁ, ইজরায়েলের পক্ষে কাজ করেছে লিয়া, কিন্তু তারা ওর সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তারপর তেল আবিবে ফিরে যাবার কথা ভাবতেই পারছে না ও।'

রানার শিরদাঁড়া আড়ষ্ট হয়ে উঠল। এটা আনকোরা নতুন একটা চমক, সম্ভাবনাটা ওর মাথাতে ধরা দেয়নি। 'ব্ল্যাকমেইল?'

লিয়া ওরফে পামেলা মাথা ঝাঁকাল। 'মাইক্রোফিল্মটা ঠিক এরকম একটা নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে রাখার কথা ভেবেছি আমি। ওটায় যে-সব লোকের নাম আছে, এবং ইজরায়েল সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারও, মুখ বন্ধ রাখার জন্যে টাকা দেবে আমাকে।'

সে থামতেই শাইখ শুরু করল, 'দেখতেই পাচ্ছেন, সার, আপনার চেয়ে লিয়ার প্রস্তাব কয় হাজার গুণ ভাল।' সরে গিয়ে লিয়ার পাশে দাঁড়াল সে, তার সরু কোমর জড়িয়ে ধরল এক হাতে। 'তা ছাড়া, আরও অনেক কিছু অফার করার আছে ওর।'

'তুমি জানলে কীভাবে যে আমি আসলে পামেলা?' জিজ্ঞেস করল লিয়া।

শ্রাগ করল রানা। 'এখানে একটু অনুমান, ওখানে একটু বিশ্লেষণ-এভাবে। তারপর সোফিয়া থেকে আমাদের লোকজন পুরানো খবরের কাগজ যোগাড় করল-যেগুলোয় তোমাদের বিয়ের ছবি ছাপা হয়েছিল। আচ্ছা, তোমার এটা অনেক পুরানো প্ল্যান, তাই না?'

'তা বলতে পারো। বাবা মারা যাবার পর আমার কোন পিছু টান নেই।'

'তোমার প্ল্যানে কি প্রথম থেকেই শাইখ ছিল?'

'না,' জবাব দিল শাইখ নিজে। 'সত্যি কথা বলতে কি, সার, আমি শুরু থেকেই আপনাদের পক্ষে ছিলাম...কাল রাত পর্যন্ত।'

'কাল রাতে বিছানায় সুন্দরী মেয়ে পেয়ে সব ভুলে গেলে?'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল শাইখ। 'সেক্স-এর ভূমিকা আমি অস্বীকার করছি না। তবে লিয়া আমাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে-যতক্ষণ মাইক্রোফিল্ম আমার সঙ্গে আছে, ততক্ষণ আমি নিরাপদ।'

'কী করে ভাবলে, শাইখ, তোমাকে আমি খুন করব না?' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল রানা।

'সেটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, রানা,' বলল লিয়া। 'আমরা দু'জন যতক্ষণ বেঁচে থাকব, ততক্ষণ মাইক্রোফিল্মটা উদ্ধারের আশাও থাকবে তোমার।'

'হুম।'

'আগেই তোমাকে বলেছি, এটা আমার অনেকদিন আগের প্ল্যান,' বলল লিয়া, কণ্ঠস্বরে উল্লাস। 'এখন এমনকী শাইখও আমাকে সাহায্য করছে। শুধু একটা ব্যাপারে প্ল্যান করা সম্ভব ছিল না-মাইক্রোফিল্ম পাওয়ার পর কীভাবে পালানো যায়-কারণ জানতাম না ওটা ঠিক কোথায় আছে।'

রানা অবাক হলো, তবে চেহারা দেখে বোঝা গেল না। 'সে তো শাইখও জানত না... আজ সকাল পর্যন্ত।'

'সকালে জানলেও, যথেষ্ট সময় পেয়েছি,' ঠোঁটের কোণ বাঁকা করে হাসল গ্রিক ক্রিমিনাল। 'তা ছাড়া, জায়গাটা পর্তুগাল হওয়ায় ভাগ্যের বিরাট সহায়তা পেয়েছি আমি।'

'কী রকম?'

'কেন, আমার আদি পেশা যে স্মাগলিং তা আপনি জানেন না? গ্রিস থেকে স্পেন আর পর্তুগালে কম মাল পাঠিয়েছি আমি? এখানে আসার পর কয়েক জায়গায় ফোন করে দেখি এখনও

বন্ধুর সংখ্যা কম নয় আমার।'

রানার তলপেট হঠাৎ খালি খালি লাগল। ও আর রানা এজেন্সির এজেন্টরা শুধু লিয়ার উপরই নজর রেখেছে, শাইখের ব্যাপারটা চিন্তাই করেনি।

'এবার সময় হয়েছে,' বলল লিয়া। 'পথ দেখাও, আবদাল। রানা, ওর পিছু নাও তুমি। অস্ত্র হাতে ঠিক তোমার পিছনে থাকছি আমি। আর মনে রেখো, মানুষ খুন করে হাত পাকানোর পরই মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আমাকে বাইরে পাঠিয়েছে।'

'মনে থাকবে,' বলল রানা। 'হামদুন বারিকের কথাও মনে থাকবে।' সরাসরি শাইখের দিকে তাকাল ও। আশা করছে লোকটা চমকাবে।

শাইখ শুধু বলল, 'লিয়া আমাকে তার ব্যাপারটাও বলেছে, সার।'

'আবদাল মেনে নিয়েছে,' বলল লিয়া। 'বারিককে না সরালে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে আমি ওর কনট্যাক্ট হতে পারতাম না।'

'বারিকের সঙ্গে আমার কোন রক্তের সম্পর্ক ছিল না,' বলল শাইখ। 'অযোগ্য একটা ছেলে। শেষ দিকে আমার তেমন কাজেও আসছিল না।'

'মুভ!' বেরেটার মাজলটা রানার শিরদাঁড়ায় চেপে ধরল লিয়া।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে শাইখ, হাতে মাইক্রোফিল্ম। রানা তার পিছু পিছু উঠছে।

এরইমধ্যে রানার মাথায় একটা প্ল্যান তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে। এ-কথা ঠিক যে লিয়া তার নিজের লোকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এটা চমকে দিয়েছে ওকে। তবে বাস্তব পরিস্থিতির কথা ভাবলে, এটাই স্বাভাবিক।

'গেটটা খোলো, রানা,' উপরের গেটের কাছে পৌঁছে নির্দেশ দিল লিয়া।

গেট খুলল রানা। উঠানে বেরিয়ে এল ওরা। স্বভাবতই সরাসরি ফ্রন্ট গেটের দিকে এগোল রানা। এটাই প্ল্যান করা হয়েছিল—দৃঢ় ভঙ্গিতে গেটকিপারকে বলা হবে, ওদেরকে ভিতরে রেখে ভুল করে তালা লাগানো হয়েছে।

কিন্তু লিয়া সে প্ল্যান অনুসরণ করছে না। রানার পিঠে অস্ত্র ঠেকিয়ে বলল, 'ওদিকে নয়, এদিকে। ভেতরে ঢোকার সময় আরেকটা পথ দেখেছি আমি, একটা মাঠে বেরুনো যায়।'

বাধ্য হয়ে দিক বদলাতে হলো রানাকে। এখন পথ দেখাচ্ছে লিয়া। তার পিছনে রানা, পিঠে খোঁচা মারছে শাইখের হাতে ধরা ওরই ওয়ালথার।

হাঁটবার গতি একটু কমিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে শাইখের উদ্দেশে ফিসফিস করল রানা, 'তুমি সত্যি বোকামি করছ, শাইখ। আগেও বলেছি, আবারও বলব।'

'কীভাবে?' অন্ধকারেও ঝিকিয়ে উঠল তার সাদা দাঁত। হাসছে সে।

'প্ল্যানটা যদি পুরানো হয়ে থাকে, কেন লিয়া শেষ মুহূর্তে তোমাকে সঙ্গে নেবে?'

'এর উত্তর পানির মত সহজ। পর্তুগাল থেকে মরক্কোয় যাবার নিরাপদ একটা রুটের ব্যবস্থা করছি আমি।'

'তারপর? ওখান থেকে?'

'তারপর? কী হয় দেখা যাবে। যদি কোন ঝুঁকি থাকে, আমি সেটা নিতে প্রস্তুত।' কাঁধ ঝাঁকাল শাইখ।

'অ্যাই, দু'জনেই চুপ করো তোমরা!' অকস্মাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল লিয়া। 'রানা, খোলো এটা।'

লকপিকের সাহায্যে গেটটা খুলল রানা। এই গেটটা কেল্লার মাঝামাঝি অংশে, একটা সাইড ওয়াল-এর গায়ে।

'এদিকে!' গেট থেকে বেরিয়ে কেল্লার পাঁচিল ঘেঁষে প্রায় ছুটছে লিয়া। 'গাড়িতে ফিরছি আমরা।'

কেল্লার পাশে প্রচুর গাছ আর ঝোপ থাকায় আড়াল পেতে ওদের কোন অসুবিধে হচ্ছে না। সে-সব পিছনে ফেলে এক সময় একটা মাঠে বেরিয়ে এল।

মাঠটা আড়াআড়িভাবে পার হচ্ছে ওরা, এই ফাঁকে ছোট ছোট বাক্যে সাবেক মিত্রদের সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে শাইখকে একটা ধারণা দিচ্ছে লিয়া।

রানার আন্দাজ আর কল্পনার সঙ্গে ব্যাপারটা প্রায় মিলে গেল। মোটা মহিলা, ডাইয়্যান, শহরের উত্তরের রাস্তায় থাকবে। এক লোক আরেকটা গাড়ি নিয়ে থাকবে সিলভেসের দক্ষিণে।

আরও তিনজন লোক অপেক্ষা করবে কেল্লার পার্কিং লটের আশপাশে, গাড়ির কাছে পৌঁছালে ওদের উপর হামলা করবার জন্য।

ইতিমধ্যে শহরের অর্ধেকটা ঘুরে এসেছে ওরা। এই মুহূর্তে কয়েকটা আঁকাবাঁকা গলির ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল আলোর একমাত্র উৎসের দিকে এগোচ্ছে–কেল্লার সামনে, পার্কিং লটে।

'ব্যস, থামো এখানে!' হঠাৎ ফিসফিস করল লিয়া। 'ওর ওপর নজর রাখো!'

একজোড়া বাড়ির মাঝখানে গাঢ় ছায়ায় দাঁড়িয়েছে ওরা। শাইখের হাত থেকে ক্যানিস্টার নিয়ে সীল খুলল লিয়া, এক এক করে মাইক্রোফিল্মের প্যাকেটগুলো স্কার্টের পকেটে ভরল। কাজটা শেষ হতে কোমরে জড়ানো একটা লম্বা সিল্ক কাপড় খুলে রানাকে বলল, 'হাত দুটো সামনে বাড়াও! কবজি দুটো এক করো!'

শাইখের হাতে ওয়ালথার, রানার কপাল বরাবর তাক করা; নির্দেশটা পালন করতে হলো ওকে। এক করা কবজি শক্ত করে বাঁধল লিয়া। খালি ক্যানিস্টারটা ওর জ্যাকেটের সাইড পকেটে গুঁজে দিল সে। তারপর শাইখের দিকে ঠেলে দিল ওকে।

'ওর ওয়ালথারটা আমাকে দাও, তারপর ওকে ঠেলে নিয়ে চলো।'

ছায়া থেকে বেরিয়ে পার্কিং লটের দিকে এগোচ্ছে ওরা। এতক্ষণে রানা লিয়ার মতলবটা ধরতে পারছে। মোটাসোটা মহিলা ডাইয়্যানের লাল ফিয়াট রয়েছে পার্কিং লটের পাশে। হুইলের পিছনে বসা লোকটাকে রানা চিনতে পারল—প্লেনে যে দু'জনকে দেখেছিল তাদের একজন।

বাকি যে দু'জনের কথা লিয়া বলেছে তারা সম্ভবত গেটকিপারের বাড়ির কাছে আছে, ওরা গেট থেকে বেরুলে পিছু নেওয়ার আশায়।

ফিয়াট থেকে এখন পাঁচ গজ দূরেও নয় ওরা। রানার পিছনে রয়েছে লিয়া। হাতে বেরেটা আর ওয়ালথার। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে, 'মাইক্রোফিল্ম আমরা পেয়েছি, পারকি!'

ফিয়াটের দরজা খুলে বেরিয়ে এল লোকটা, দেখা দিল বত্রিশ পাটি দাঁত, মুখে হাসি আর ধরে না। লম্বা পদক্ষেপে দূরত্বটুকু পার হয়ে তার বুকে ওয়ালথার ঠেকিয়ে তিনটে গুলি করল লিয়া।

দ্রুত হাতে ম্যাগাজিন বের করে নিয়ে ওয়ালথারটা রানার হাতে গুঁজে দিল সে, পরমুহূর্তে ওকে ধরে ঘোরাল, ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে শিরদাঁড়ার গোড়ায় গুঁতো মারল প্রচণ্ড। তারপর সাপের মত ফোঁস-ফোঁস করে উঠল।

'ছোটো, রানা! দৌড়াও! হয় পালাও, তা না হলে এখানেই গুলি করে ফেলে দেব তোমাকে!' হুমকিটা যে মিথ্যে নয়, বোঝাবার জন্য গুলি করল লিয়া—রানার কানের ঠিক পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা।

বাড়িগুলোর ছায়া লক্ষ করে ছুটছে রানা। কেল্লা, অর্থাৎ ওর ডান দিক থেকে দু'জোড়া বুট পরা পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। সেগুলোকে ছাপিয়ে উঠল লিয়ার তীক্ষ্ণ চিৎকার।

'মাইক্রোফিল্ম ওর কাছে! ধরো ওকে! আমি গাড়ি নিয়ে ওর পথ আটকাবার চেষ্টা করছি।'

বাড়ি দুটোর মাঝখানে ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা, আরও দু'বার

গর্জে উঠল বেরেটা—পায়ের পাশে পাথরের খানিকটা করে ছাল তুলল বুলেটগুলো।

লাফিয়ে উঠে আবার ছুটছে রানা। ছুটন্ত পায়ের শব্দ ভেসে আসছিল পিছন থেকে, চাপা পড়ে গেল ফিয়াট স্টার্ট নিতে।

বাড়িগুলোকে পিছনে ফেলে আবার মাঠে বেরিয়ে এল রানা। কিছুক্ষণ দৌড়াবার পর সামনে একটা বেড়া পড়ল। লাফ দিয়ে টপকে আবার ছুটছে। হাত দুটো এক করে বাঁধা থাকায় গতি বেশি নয়। রানা জানে ধরা পড়ে যাচ্ছে ও। অনেক কাছে চলে এসেছে পায়ের আওয়াজ।

মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে ঘুরল। বাঁধা হাত দুটো মাথার উপর উঁচু করল। আঙুল দিয়ে নেড়েচেড়ে বাঁটের বদলে ওয়ালথারটার ব্যারেল ধরল।

বেড়ার কাছে এসে দু'জনেই দেখতে পেল ওকে। ডাইভ দিয়ে ঘাসে পড়ল তারা, উপুড় হয়ে দেখছে।

'তোমাদের বোকা বানানো হয়েছে,' গলা চড়িয়ে বলল রানা, হিব্রুতে।

'ধীরে ধীরে এগোও এদিকে!' উত্তরে তাদের একজন চেঁচিয়ে বলল।

হাত দুটো উঁচু করে রেখে এগোল রানা। নিচু বেড়াটা টপকে থামল।

লোকগুলো তিন ফুট দূরে। হঠাৎ একযোগে লাফ দিল তারা, তারপর ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল রানাকে। সার্চ শেষ করতে মাত্র কয়েক সেকেন্ড লাগল তাদের।

'ক্যানিস্টার খালি। আমার পিস্তল খালি। মাইক্রোফিল্ম আছে সামি কাদরির ওয়াইফের কাছে।'

জবাবে, খেপে গিয়ে, রানার পেটে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল একজন। অপরজন বুট চালাল পাঁজরে।

'মাইক্রোফিল্ম দে! কোথায় ফেলেছিস ওগুলো?'

'আমার কাছে থাকলে তো ফেলব। কী বলছি বোঝার চেষ্টা করো। তোমাদের পামেলা ওরফে লিয়া অনেক আগেই প্ল্যান করেছে মাইক্রোফিল্ম নিজের জন্যে চুরি করবে, যাতে মোসাদের কর্মকর্তা এবং ইজরায়েল সহ আরও দশটা সরকারকে ব্ল্যাকমেইল করা যায়।

'আবদাল শাইখের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছে সে। তার সাহায্য নিয়ে পর্তুগাল ছেড়ে বেরিয়ে যাবে। আমার ধারণা, শাইখের একটা বোট উপকূলের কোথাও অপেক্ষা করছে। পকেটে টু-ওয়ে দেখতে পাচ্ছি, ওটা ব্যবহার করো, তোমাদের রোডব্লকে যারা আছে তাদেরকে সাবধান করে দাও!'

'তুমি মিথ্যে কথা বলছ!'

'না, সত্যি কথা বলছি।'

'সব মিথ্যে, শালা বাঙালী!'

'ওরে বানচোত ইহুদি, মিথ্যে কথা বলে আমার কোনও লাভ আছে? লিয়া যে কী, এ আমি আগেই জেনেছি। তবে জানতাম না সে এই কাণ্ড করতে যাচ্ছে। জানলে এখন ও কেল্লার ভিতর থাকত—লাশ হয়ে।'

বাস্তব পরিস্থিতি মেনে নিতে আরও ষাট সেকেন্ড সময় নিল লোক দুজন। তারপর রেডিও অন করল একজন: 'ডেইয়্যান! ডেইয়্যান!' ঘেউ ঘেউ করছে সে। 'লিয়া আমাদের সঙ্গে বেঈমানী করেছে!'

'হো-হোয়াট?' উত্তরে নারীকণ্ঠ শোনা গেল।

'সে তোমার ফিয়াটে আছে। তুমি কি ওটাকে উত্তরে যেতে দেখেছ?'

'না। গাড়ির আলোটাকে আমি দক্ষিণে, লাগোয়া-র দিকে যেতে দেখলাম।'

'পারকি! পারকি!'

'পারকিকে পার্কিং লটে খুন করেছে লিয়া,' বলল রানা।

'তারপর পিস্তলটা খালি করে আমার হাতে গুঁজে দিয়েছে।'

বিস্ময়ের ধাক্কা আর ভয়ে লোক দু'জনের চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেছে।

'দানিশ! দানিশ!' আবার রেডিওতে চিৎকার করল সেই লোকটা।

কোন সাড়া নেই।

'দানিশ, জবাব দাও! মেয়েলোকটা আমাদের সঙ্গে বিট্রে করেছে! লাল ফিয়াট নিয়ে তোমার দিকেই যাচ্ছে সে!'

সাড়া নেই।

'দক্ষিণের রাস্তায় লোকটা যদি তোমাদের দানিশ হয়ে থাকে,' ভারী গলায় বলল রানা, 'জেরুজালেমের বদলে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা বাজি ধরব আমি—পারকির মত সে-ও মারা গেছে।'

প্রাচীন হিব্রু ভাষায় অকথ্য খিস্তি আর রোমহর্ষক অভিশাপ দিল তারা। একজন রানার মুখের ঠিক মাঝখানটায় ঘুসি চালাল। লাগলও ওখানে। দ্বিতীয় লোকটা, ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়েছে, পর পর দুটো লাথি কষল পাঁজরে। তবে রানা হাত দিয়ে ঠেকাতে পারল বলে রক্ষে, তা না হলে হাড়গুলো ভাঙত।

পার্কিং লট লক্ষ্য করে ছুটছে তারা।

ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে সিধে হলো রানা, ধীরে ধীরে গাড়িগুলোর দিকে ফিরছে। দাঁত দিয়ে ধরে গিঁট খোলা বা কামড়ে সিল্কের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, কোনটাই সম্ভব হলো না। একটা বাড়ির কোণে থামল ও, দেখল বাড়িটার দেয়াল শুধু প্লাস্টার করা হয়েছে, চুনকাম করা হয়নি। কোণটা বেশ ধারাল, কিছুক্ষণ ঘষতেই সিল্ক কাপড় ছিঁড়ে গেল। এই সময় ইঞ্জিন স্টার্ট নেওয়ার আওয়াজ ভেসে এল, সেই সঙ্গে রাস্তার সঙ্গে চাকার ঘর্ষণজনিত গা রি-রি করা শব্দ।

সম্ভবত ডাইয়্যান, ভাবল রানা, লোক দু'জনকে তুলে নিল।

মনে হলো এক যুগ পর, আসলে দু'মিনিট, পার্কিং লটের

কিনারায় এসে পৌঁছাল রানা। ওর রেন্টাল কার এখনও জায়গা মত দাঁড়িয়ে–শেষ মাথায়।

অনেকটা ঘুরে এল রানা। তালা খুলে গাড়িতে উঠল। ব্যাক সিটে ওর ব্যাগটা পড়ে আছে। সেটা খুলে এক্সট্রা ক্লিপ বের করে ভরল ওয়ালথারে।

বলা যায় এক রকম প্রার্থনাই করছে রানা, পিস্তলটা যেন ব্যবহার করতে না হয়। পরবর্তী শো ইজরায়েলিদের। এটাই চাইছিল ও।

রানা শুধু শেষ দৃশ্যটা দেখতে চায়, যদি সম্ভব হয়।

পার্কিং লটটা ঢালু, নেমে গেছে দক্ষিণ দিকে। ঢাল থেকে রাস্তায় নেমে আসবার পর আলো জ্বালল রানা। ফিয়াটটা যেখানে পার্ক করা ছিল, সেদিকটায় তাকাল ও। কোন চিহ্ন নেই পারকির।

ওরা ওদের লাশ ফেলে রেখে যায় না। আসলে নিতে হয় বাধ্য হয়ে। এই টাইপের লোকজনকে সহজেই ট্রেস করা যায়। তা ছাড়া, বিশেষ করে এই অপারেশনটা চুপচাপ সারতে চেয়েছে ইজরায়েলিরা। তা অবশ্য রানাও চেয়েছে।

শালা শাইখ!

শালী লিয়া!

শহর থেকে আধ মাইল দূরে আরেকটা ফিয়াট পার্ক করা রয়েছে। এটা নীল।

গাড়িটার পাশে থামল রানা। নীচে রাস্তায় রক্তের দাগ দেখল। উঁকি দিতে ফ্রন্ট সিটের পিছনেও।

ওরা আহত লোকদেরও নিয়ে যায়।

আবার রেন্টালে উঠে দক্ষিণে ছুটল রানা। এখন প্রায় মাঝরাত। লাগোয়ার পথ-ঘাট নির্জন।

এবার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাম দিকে চলে গেছে ফারো, ডানদিকে পোর্টিমাও। ওর সরাসরি সামনের রাস্তা চলে গেছে একটা জেলেদের গ্রামে, নাম প্রাইয়া দেয় কারভোইরো। গ্রামের

পর সৈকত।

সোজাই ছুটল রেন্টাল। সরু রাস্তা। চাঁদটাকে বড় এক টুকরো মেঘ এই মাত্র গিলে ফেলল। তবে রানা স্পিড কমাচ্ছে না।

বড় একটা বাঁক ঘুরল। বাঁ দিকে জিপসিদের এক সারি ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তা থেকে ত্রিশ ফুট দূরে ক্যাম্প ফায়ারকে ঘিরে মদ্যপান করছে কয়েকটা মূর্তি।

গাড়ি থামিয়ে নামল রানা, ছুটে আগুনটার কাছে পৌঁছাল।

দৈত্যাকার এক লোক আগুনের পাশে সিধে হলো, কোমরের খাপ থেকে ছোরাটা অর্ধেক বের করে এনেছে।

মুঠো খুলে দেখাল রানা–টাকায় ভর্তি। 'শান্তি, বন্ধু, শান্তি!' বলল ও। 'লাল একটা ফিয়াট। খুব স্পিডে ছুটছে। বলতে পারো কোন দিকে গেছে?'

টাকাগুলোর দিকে তাকাল লোকটা। তার হাতে ওগুলো গুঁজে দিল রানা।

'লাল গাড়ি থেমেছিল, ওই গাছগুলোর পাশে। একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পাই। আমরা কিছু জানি না।'

'ধন্যবাদ।'

'একটু থামুন। আপনার কাছে আরও টাকা আছে?'

আরও কিছু টাকা দিল রানা।

'ওদিক থেকে আরেকটা গাড়ি এল। সেটাও ওই একই জায়গায় থামল, ব্যাক করল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর চলে গেল আবার। আমরা কিছু জানি না।'

ফিরে এসে গাড়িতে চড়ল রানা। গাছগুলোর দিকে সাবধানে এগোচ্ছে। ওয়ালথারের সেফটি অফ করে রাখল।

তার আসলে দরকার ছিল না।

দু'সারি কর্ক গাছের ভিতর দিয়ে পঁচিশ-ত্রিশ গজ এগোতেই ডান পাশে কী যেন নড়তে দেখল রানা। তার পর গোঙানির আর বমি করবার শব্দ। এই সময় মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা বেরিয়ে

এসে একজোড়া পায়ের উপর আলো ফেলল।

গাড়ি থেকে নেমে সেদিকে এগোল রানা। 'শাইখ...শাইখ, তুমি?'

'হ্যাঁ, সার...আমিই–আবদাল শাইখ, বোকার হদ্দ বোকা। বোকাটা এখানে বসে নিজের নাড়িভুঁড়ি ভেতরে গোঁজার চেষ্টা করছে।'

এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোল রানা, তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তা থেকে ক্রল করে এদিকে এসে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসেছে শাইখ। মুখটা সাদা হয়ে গেছে।

'কোথায়?' সংক্ষেপে জানতে চাইল রানা। তার পাশে হাঁটু গাড়ল।

'গুলি? একটা ডান কাঁধে, বেশ ওপরে; আরেকটা পেটে। তারপর ছুরি মেরে পেট ফেড়ে দিয়ে গেছে।'

'ডাইনী!' দাঁতে দাঁত চাপল রানা।

'আপাদমস্তক, সার, আপাদমস্তক। রূপ দিয়ে ভোলায়, সার।'

'কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল গ্রিক ক্রিমিনাল। তারপর কর্কশ শব্দে কিছুক্ষণ কাশল। কাশি থামতে বলল, 'চুক্তিটা মেনে চলার কোন ইচ্ছেই তার ছিল না। শুধু বলেছি বে-র কোন দিকটায় আমার পরিচিত ইয়েমেনী অপেক্ষা করবে, ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে আমাকে গুলি করল। সেটা কাঁধে লাগে। আমি গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে পারি, কিন্তু সাপের মত ক্ষিপ্র সে...'

'ইয়েমেনী লোকটা কোথায় অপেক্ষা করবে?'

'বে অভ দা মুন-এ। ওটা...'

'কারভোইরো থেকে দু'কিলো পশ্চিমে,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'ছোট্ট একটা ইনলেট, আলজিরিয়ান রিফিউজি ভিলেজের ঠিক দক্ষিণে।'

'আপনি চেনেন!' খক খক করে আবার কিছুক্ষণ কাশল

শাইখ। 'রাস্তা থেকে আমাকে ক্রল করে নামতে দেখেছে ইজরায়েলিরা। লিয়া কোনদিকে গেছে, তাদেরকে আমি বলেছি। ভাল করেছি, তাই না, সার?'

'এসো,' বলে বগলের তলায় হাত গলিয়ে শাইখকে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা।

'আপনি তা হলে আমাকে ফেলে রেখে যাচ্ছেন না?'

'না।'

'আপনি জানেন আমি মারা যাচ্ছি।'

'জানি। আমি শুধু চাইছি না এখানে তুমি মরো, মরার আগে এর-তার সঙ্গে কথা বলো।'

'ওহ্, সার, কেউ বলবে না মাসুদ রানা নিজের স্বার্থ বোঝে না!'

'সবারই তা বোঝা উচিত। আমারটা আমি বুঝি বলেই এ পর্যন্ত বিপদকে ফাঁকি দিয়ে এসেছি।'

শাইখকে হাঁটিয়ে এনে গাড়িতে তুলল রানা।

'গাড়িটা রক্তে ভরে যাবে।'

'এটা ভাড়া করা।'

গ্রামের উত্তরে চলে এল গাড়ি। ছোট একটা সাইড রোড ধরতে বলল শাইখ। এটা বোধহয় কেউ ব্যবহারই করে না। 'শর্টকাট,' বলল সে। 'ভাগ্য ভাল হলে ডাইনীকে আমরা ওদের আগেও ধরতে পারি।'

সরু রাস্তা ধরে আরও দশ মিনিট ছুটল গাড়ি। চাঁদের আলোয় পথ দেখছে রানা, হেডলাইট জ্বালছে না। 'তুমি ওখানে না থাকলেও ইয়েমেনী লোকটা কি লিয়াকে সাহায্য করবে?'

'করবে।' হেসে উঠতে গিয়ে মুখ বিকৃত করল শাইখ। 'সে ব্যাটা আমার চেয়েও অধম, ছিঁচকে চোর। টাকা পেলে পারে না এমন কাজ নেই। এবার বাঁ দিকে বাঁক নিন, সার। এই পথেই ইনলেটের মাথায় পৌঁছানো যাবে।'

গাড়ি চালিয়ে পাথুরে পাহাড়-প্রাচীরের একেবারে কিনারায় চলে এল রানা। ইঞ্জিন বন্ধ করল, নীচে নামবার সময় বলল, 'তুমি বসো, আমি দেখি কী ঘটেছে।'

সাবধানে হেঁটে এসে কিনারায় থামল রানা, উঁকি দিয়ে সরাসরি দুশো ফুট নীচে তাকাল।

একেবারে ঠিক সময়ে পৌঁছেছে ওরা। ওর ডান দিকে, নীচের রাস্তায়, একটা গাড়ির আওয়াজ হলো, তারপর আবার নীরবতা। ওর আরও নীচে সৈকত খালি পড়ে আছে, তবে পঞ্চাশ গজ দূর থেকে একটা শক্তিশালী মোটর লঞ্চ ধীর গতিতে ঢুকছে বে-তে।

ওর ডান দিক থেকে ভেসে আসা গলার আওয়াজগুলো শুনে বোঝা গেল, লোকগুলো বিভ্রান্তিতে ভুগছে। তারা একই সঙ্গে তিন দিকে এগোচ্ছে বলে মনে হলো। বালিতে নাক তুলে দিল লঞ্চটা। সরাসরি নীচের একটা ঝুল-পাথরের আড়াল থেকে লিয়াকে বের হতে দেখল রানা।

ইজরায়েলিরা তাকে ধরতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।

তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না। কারণ, আজ লিয়া মাইক্রোফিল্ম নিয়ে পালাতে পারলেও, সে ব্ল্যাকমেইল শুরু করলে ইজরায়েলসহ অন্যান্য দেশের প্রভাবশালী লোকজন ঠিকই তার খোঁজ বের করে ফেলবে। এই পেশায় একা কেউ কখনও টিকতে পারে না। লিয়াকে এখন আর ওদের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সও প্রোটেকশন দেবে না।

মাইক্রোফিল্মগুলো লিয়া নিয়ে যাক বা ইজরায়েলিরা উদ্ধার করুক, রানার তাতে কিছু আসে যায় না।

শামিম আর প্রভাতি, দু'জন মিলে ওগুলোর কপি তৈরি করেছে, এই মুহূর্তে পোর্টিমাওয়ের একটা হোটেলে আছে সব। বিসিআই সময়মত সংশ্লিষ্ট মুসলিম সরকারগুলোকে জানাবে তাদের রাষ্ট্রযন্ত্রের কে আর কারা ইজরায়েলিদের পরম উপকারী বন্ধুর ভূমিকা পালন করছে, যার ফলে ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন

হওয়ার স্বপ্ন যুগের পর যুগ স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে।

এবড়োখেবড়ো একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে ওয়ালথার তুলল রানা, লঞ্চটার উইন্ডশিল্ডে স্থির করল লক্ষ্য।

পরপর চারটে গুলি করল ও।

শেষ বুলেটের প্রতিধ্বনি তখনও বাতাসে মিলিয়ে যায়নি, লঞ্চের ইঞ্জিন রিভার্স করা হলো। সৈকত ধরে ছুটছে লিয়া, অন্ধকারে চেঁচাচ্ছে। ফেটে মাকড়সার জাল হয়ে গেছে উইন্ডশিল্ড, সেটার পিছনে আতঙ্কিত একটা মুখ।

লাফ দিয়ে পানিতে নামল লিয়া, কিন্তু লঞ্চ এরইমধ্যে বিশ গজ পিছিয়ে গেছে।

শাইখের ইয়েমেনী বন্ধু লঞ্চটাকে ১৮০ ডিগ্রি বাঁক ঘোরাচ্ছে। ইঞ্জিনের গর্জনে কান পাতা দায়, অথচ সেটার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে লিয়ার কণ্ঠস্বর।

তারপর বেরেটা তুলে অদৃশ্যমান লাল আলোগুলোকে লক্ষ্য করে দুটো গুলি করল লিয়া। শুধু শুধু।

রানার ডানদিকে কাঠের সিঁড়ি, ধাপগুলো থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এল

'পামেলা! মিসেস কাদরি!' ভারী একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। হিব্রু ভাষায় কথা বলছে, 'হাতের অস্ত্র ফেলে দাও, তা না হলে তোমাকে গুলি করা হবে।'

সাগরের পানিতে ঝট করে ঘুরল লিয়া। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কী বলল বোঝা গেল না, সম্ভবত গালি বা অভিশাপ দিল। তারপর বেরেটা তুলে গুলি করল দুটো।

সিঁড়ির ধাপে ব্যথায় কাতরে উঠল কেউ। তারপরই এক সঙ্গে বিশ সেকেন্ড চলল বিরতিহীন গুলিবর্ষণ।

পানি থেকে উঠে এসেছিল লিয়া। শরীরটা ঝাঁকি খেতে খেতে, পিছিয়ে যেতে লাগল। তারপর ঝপাৎ করে পড়ে গেল পানিতে।

ইজরায়েলিরা পানি থেকে লাশটা তুলে সার্চ করল। চাঁদের আলোয় তাদের আনন্দোল্লাস দেখে রানা বুঝতে পারল, মাইক্রোফিল্মগুলো তারা পেয়েছে।

ঘুরে গাড়ির দিকে ফিরছে রানা, অন্ধকার থেকে মিষ্টি এবং অতি পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল: 'রানা?'

স্থির হয়ে গেল রানা। গোটা অস্তিত্বে ভাল লাগার একটা অনুভূতি। 'সোহানা, তুমি?'

ছায়া থেকে আলোয়, রানার সামনে বেরিয়ে এল সাদা ব্লকউজ আর ঘিয়ে স্কার্ট পরা নারীমূর্তি, 'হ্যাঁ। আমি তো বুড়োর হুকুমে গত কয়েক দিন ধরেই আড়াল থেকে কাভার দিচ্ছি তোমাকে।'

'ওহ্, ধন্যবাদ,' বলল রানা।

আশ্চর্য! ভাবল ও, সোহানার উপস্থিতি টেরই পাওয়া যায়নি! আরও একটা কথা ভেবে গরম হয়ে উঠল ওর কলজের ভিতরটা: বুড়ো সত্যিই ভালবাসে আমাকে! সোহানার চেয়ে কম নয়!

সোহানাকে নিয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এল রানা। 'তুমি শুনে খুশি হবে, শাইখ, লিয়া পালাতে পারেনি।'

কিন্তু শাইখ ওর কথা শুনবার জন্য ওখানে নেই। ওখানে কেন, পৃথিবীর কোথাও নেই সে।

নরম গলায় বলল সোহানা, 'এই তো, দুই মিনিট আগে মারা গেল। মারা যাওয়ার আগে ও ক্ষমা চেয়েছে তোমার কাছে।'

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

আরেক গডফাদার

কাজী আনোয়ার হোসেন

এরচেয়ে কঠিন অ্যাসাইনমেন্ট আর পায়নি রানা।
মাসুদ রানাকে এমন কিছু করতে হবে,
মাফিয়োসোরা ওকে যাতে সাদরে বরণ করে নেয়।
কাজে হাত দেওয়ার পর ধীরে ধীরে প্রকাশ পেল
একজন ভারতীয় সন্ন্যাসীর অবিশ্বাস্য, অলৌকিক ক্ষমতা।
তারপর দেখা হলো রূপ-যৌবনের আধার নাদিয়ার সঙ্গে;
মেয়েটি ওর ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে। গোটা ইউরোপ
ঘুরে এসে উত্তর আমেরিকার চল্লিশজন মাফিয়া ডনকে
এক জায়গায় জড়ো করছে রানা। কে জানে তারপর কী হবে!

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

মোঃ রায়হান রাসেল,
নিয়ামতপুর, নওগা।

প্রথমে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা। কাজীচা, (দাদা হলে দা, চাচা হলে চা!) বলা যায় আমাদের পরিবারটি সেবা পরিবার। আমার বাবা ও আমরা পাঁচ ভাইবোন সবাই সেবার বই পড়ি। আমরা তিন পুরুষ ধরে সেবার ভক্ত। বিশেষ করে মাসুদ রানা, ওয়েস্টার্ন ও অনুবাদ বেশি করে পড়ি। আমার বাবা সেবা প্রতিষ্ঠার পর থেকে কুয়াশা পড়তেন, এখনও একজন ভক্ত এবং সেবার বই পড়েন। বাবা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেন ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ছিলেন। হয়তো নিজের দেশপ্রেম তিনি আপনার মাসুদ রানা সিরিজের মাধ্যমে অনুভব করেন বা দেখতে পান। কাজীচা, বাবার জন্য দোয়া করবেন। ক্যান্সার হওয়ায় তিনি গত দেড় মাস যারত কলকাতায় আছেন চিকিৎসার জন্য। ভালো হবেন কি না আল্লাহ জানেন। আমার নানা গত ২০০০ সনে মারা যান। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি সেবার বই পড়তেন। আমার বাবা আজ মারা যাওয়ার পথে, তবু সেবার বই পড়েন। আশা রাখি আমরা পাঁচ ভাইবোনও মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেবার বই পড়ে যাব। 'আর কতোদূর' থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত মাসুদ রানা এবং ওয়েস্টার্ন সিরিজের প্রায় সব বই আমার পড়া। পারিবারিক কথা লিখে কাউকে বিরক্ত করে থাকলে ক্ষমাপ্রার্থী।

☆ প্রিয় রাসেলজা (ভাতিজা হলে জা), তোমাদের পাঁচ ভাইবোনের জন্যে রইল আমার শুভকামনা। অন্তর থেকে দোয়া করছি, তোমার আব্বা

যেন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসতে পারেন। তিনি পরিবারে যে-রকম চমৎকার অধ্যয়ন-পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, সে জন্য তাঁর প্রতি রইল আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

শামীম আল-মামুন (নিশাত),

মিরের বেতকা, টাঙ্গাইল।

একটা সমস্যায় পড়ে লিখতে হলো। 'অগ্নিপুরুষ' বইটিতে মাসুদ রানা মারা যায়। রাহাত খান ওকে কবর দেন। তারপর ও ভায়োলার কাছে কীভাবে ফিরে যায়? 'জন্মভূমি' ও 'শয়তানের দোসর' বই দুটিতে উল্লেখ করা আছে কবীর চৌধুরী মারা গেছে। অথচ ২০০৩-এ প্রকাশিত 'কনকতরী' বইটিতে ভিলেনের মূল চরিত্রে আছে কবীর চৌধুরী। এটা সম্ভব হয় কীভাবে? একটা অনুরোধ করব। রানা, সোহেল, জাহেদ, সলীল ও নাসের–এই পাঁচ বন্ধুকে নতুন একটা বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে একটা বই লিখুন। সেবার সাথে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ।

★আপনিও আমাদের সবার ধন্যবাদ নিন। 'অগ্নিপুরুষে' রানাকে মাফিয়ার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে মিছেমিছি কবর দেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। একথা অবশ্য যাঁরা বইটা পড়ে বুঝতে পারেননি তাঁদের প্রশ্নের উত্তরে অনেক বইয়েই বলা হয়েছে–আপনি কোনও ভাবে মিস করে গেছেন। কবির চৌধুরীর ব্যাপারটাও তাই। সে ডুব দিয়েছিল রানার ভয়ে।

আপনার আইডিয়াটা ভাল লাগছে আমার, উপযুক্ত কাহিনী গুছাতে পারলে ওদের পাঁচজনকে নিয়ে লেখা তো যায়ই।

মোঃ রোমেল হাসান

গয়েশপুর, পাবনা।

আপনার 'ধ্বংস-পাহাড়' থেকে শুরু করে 'অপারেশন কাঞ্চনজংঘা' পর্যন্ত প্রায় সবই আমি পড়েছি। এর মধ্যে আমার সংগ্রহে প্রায় ৩২০টি বই আছে। আমার বাবা, বড় ভাই ও আমি–তিনজনই আপনার একান্ত ভক্ত। আপনার এপর্যন্ত যতোগুলো বই পড়েছি সবই ভাল লেগেছে। তবে সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছে 'অগ্নিপুরুষ' বইটি পড়ে। আমি জীবনে কোনদিন কোন ছবি দেখে বা বই পড়ে এতো আনন্দ পাইনি। আবার খুব কষ্টও হয়েছে লুবনার মৃত্যুতে রানার কষ্ট দেখে। কেঁদে ফেলেছিলাম। আশা করি আগামী কোন বইতে আপনি রানাকে এতো কষ্ট দেবেন না। সবার প্রতি শুভেচ্ছা।

★নিজেই বলছেন: আপনি জীবনে কোনদিন কোন ছবি দেখে বা বই পড়ে এতো আনন্দ পাননি। তার মানে, রানা কষ্ট পেয়েছে বলে আপনি কেঁদেছেন, এবং কাঁদতে পেরেছেন বলে আপনার আনন্দ হয়েছে। ওকে কষ্ট না দিলে কি আপনি এতটা আন্দোলিত হতেন?...আপনাদের তিনজনের জন্যই আমাদের সবার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই **মানি-অর্ডার যোগে** ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২১/৬/'০৪ গোয়েন্দা রোবট (তিন গোয়েন্দা/সেবা DD) শামসুদ্দীন নওয়াব

বিষয়: বিজ্ঞান মেলা হচ্ছে কিশোরদের স্কুলে। ওরা সবাই অংশ নিচ্ছে। একেকজন একেক রকম প্রজেক্ট বানিয়েছে। কিন্তু গোপনে কে যেন সেরা দুটো প্রজেক্ট চুরমার করে দিল। সবার সন্দেহ গিয়ে পড়ল তিন গোয়েন্দার এক বন্ধুর উপর। অথচ ছেলেটি কসম খেয়ে বলছে এ কাজ সে করেনি। কিশোরের দৃষ্টিতে সন্দেহভাজন বেশ কজন। তাদের মধ্য থেকে অপরাধীকে খুঁজে বের করতে হবে। ম্যাডাম কেসটা তুলে দিলেন তিন গোয়েন্দার হাতে।

২৭/৬/'০৪ রহস্যপত্রিকা (২০ বর্ষ ৯ সংখ্যা) জুলাই, ২০০৪

আরও আসছে

৪/৭/'০৪	মুখোশ পরা মানুষ	(তিন গোয়েন্দা/কি.থ্রিলার)	শামসুদ্দীন নওয়াব
১১/৭/'০৪	হার্ডি স্লোন	(ওয়েস্টার্ন)	কাজি মাহবুব হোসেন
১১/৭/'০৪	বিষকন্যা ১+২	(রানা/রিপ্রিন্ট)	কাজী আনোয়ার হোসেন
১৮/৭/'০৪	আরেক গডফাদার	(রানা ৩৪১)	কাজী আনোয়ার হোসেন
১৮/৭/'০৪	নীল বজ্র ১+২	(রানা/রিপ্রিন্ট)	কাজী আনোয়ার হোসেন